জুল ভের্নের শ্রেষ্ঠ গল্প

অনুবাদ

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জুল ভের্ন : শ্রেষ্ঠগল্প

অনুবাদ

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
—বৈশাখ ১৩৮৩
—মে ১৯৭৬

পঞ্চম সংস্করণ :
—আষাঢ় ১৩৯৪
—জুলাই ১৯৮৭

প্রকাশক :
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদপট :
গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সামন্ত
বাণীশ্রী
১৫/১ ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

দাম : ১০ টাকা

অনুবাদকের উৎসর্গ

নমিতা ও স্বপন মজুমদারকে

ভূমিকা

জুল ভের্ন যে অনেকগুলো চমৎকার ছোটোগল্প লিখেছিলেন, তাঁর নামজাদা বইগুলোর পাশে তা আমাদের খেয়ালই থাকে না। এই বই জুল ভের্ন-এর গল্প লেখার নৈপুণ্যের সঙ্গে আমাদের নতুন ক'রে পরিচয় করিয়ে দেবে। এই অনুবাদগুলো বিভিন্ন সময়ে 'মৌচাক 'শুকতারা' ও 'আশ্চর্য'-তে বেরিয়েছিলো।

গল্পগুলো পড়তে গিয়ে প্রথমেই চোখে পড়বে তাদের বিষয়গত ও রচনাগত বৈচিত্র্য। কোনো গল্প ব্যঙ্গবিদ্রূপে ভরা, কোনোটা রগরগে ওরুদ্ধশ্বাস, কোনোটা ভয়ধরানো, রোমাঞ্চকর। কখনো মনে পড়বে এডগার অ্যালান পো-কে, কখনো-বা এ. টে. আ. হোফমানকে—অথচ দেখা যাবে এদের মধ্যে জুল ভের্ন-এর নিজের ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যও সুপরিস্ফুট। বিশেষত গথিক গল্প-উপন্যাসে তাঁর যে অপরিসীম আগ্রহ ও নৈপুণ্য ছিলো, তারও পরিচয় দেবার জন্য এই বইয়ের প্রয়োজন ছিলো।

একসময় গথিক গল্প-উপন্যাসের দারুণ চাহিদা ছিলো ইওরোপে। রিফর্মেশনের সময় থেকে এই সেদিনও, উনিশ শতাব্দীর প্রযুক্তি ও কারিগরি বিদ্যার স্বর্ণযুগের সময় পর্যন্ত! ঐতিহাসিক কতগুলো কারণ ছিলো নিশ্চয়ই—যার জন্য এমনকি এই সেদিনও 'ড্রাকুলা'র মতো লেখা হ'তো ও জনপ্রিয় হ'তো—যাকে ঠাট্টা ক'রে এই তো ক'বছর আগে রোমান পোলান্স্কি তাঁর 'ফিয়ারলেস ভ্যামপায়ার কিলার্স'-এর মতো মজার ছবিটি তুলেছিলেন।

একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে গথিকের দুটি প্রধান সহযোগী ধারা ছিলো: এক দিকে ভ্যামপায়ার, অয়্যারয়ুল্ফ, ডোপ্পেলগ্যাঙ্গের, আর অন্য দিকে মেরি শেলি-র 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন'—রোমান্টিকতার এক ইশতেহার বা দলিল ব'লে যাকে আজ আমরা ধরছি।

ভ্যামপায়ার গল্পগুলো আসলে কী? শোষিত বঞ্চিত সাধারণ মানুষের ঘোরানো ও লুকোনো প্রতিবাদ : ধনী কাউন্টের অকথ্য অত্যাচার—তার রক্তশোষণ, নারীধর্ষণ, সাধারণ লোকের সম্পত্তিহরণ—আর তার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য কাঠের ক্রুশ, বাইবেল আর রসুনের কোয়া—অর্থাৎ খ্রীস্টধর্ম আর কুসংস্কার। যখন রুখে দাঁড়াবার বা প্রতিবাদ করারও ক্ষমতা নেই, তখন ধর্ম আর কুসংস্কারই হয়তো লোকের রক্ষাকবচ, অভয়পত্র।

কিন্তু, কারিগরি বিদ্যা আর বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে অবস্থার বদল হ'তে লাগলো। পুরোনো কাউন্টের বদলে এলো উদ্ভাবক ও প্রযুক্তিবিদ—যাদের আবিষ্কার আস্ত জগৎটারই ভোল পালটে দিচ্ছে। তারা ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী, কারণ তারা আস্ত সৃষ্টিটাতেই ওলোটপালোট ঘটাচ্ছে—আর ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী, ব'লেই শয়তানের সহযোগী, শয়তানের সহচর। কিন্তু যদি তাদের নিজের সৃষ্টিই একদিন তাদের বিরুদ্ধে যায়? এখানেও পুরোনো বিশ্বাস, সংস্কার বা ধর্মের ভূমিকা নেহাৎ নগণ্য নয়।

আমরা জানি, জুল ভের্ন বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পের জনক—কিন্তু তিনি যে সায়ান্স ফিকশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গল্পের এই ধারাগুলো নিয়েও ভেবেছিলেন, তারই অবিস্মরণীয় নজির এই *Maitre Zacharius ou l' horloger qui a perdu son ame*', 'অর্থাৎ 'মাস্টার জাকারিয়ুস' আর *Frtt-Flac*'টুপটাপ', নানা ধরনের আচ্ছন্ন চিন্তা মিলেছে এখানে, অথচ গল্পের গতি দুর্বার, কল্পনার ক্ষিপ্রতা দূরপ্রসারী। আর তারই পাশাপাশি আছে মানুষের আকাশবিজয়ের কাহিনী, খ্যাপা বিজ্ঞানমুগ্ধ মানুষ, আর উপনিবেশ প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র বিদ্রূপে ভরা কশাঘাত—'শূন্য পুরাণ' আর 'জিল ব্রালটার' যার উদাহরণ। গল্পগুলো যে শেষ হবার পরেও রেশ রেখে যায়, ভাবায়, তা-ই জুল্ ভের্ন-এর সাফল্যের নিদর্শন।



জুল ভের্ন (১৮২৮-১৯০৫)

জিল ব্রালটার

অন্তত সাত-আটশো জন হবে তারা সংখ্যায়। মাঝারি গড়ন, কিন্তু সবল, ক্ষিপ্র, নমনীয় ; অদ্ভুত একেকটা লাফ দেবার ক্ষমতা আছে হাঁটুতে। সূর্যাস্তের শেষ রশ্মিতে তারা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। রাজপথের পশ্চিমে প্রাচীরের মতো উঠে গেছে পাহাড়, তার ওপাশে সূর্য ডুবে যাচ্ছে। তার জলন্ত লাল বর্তুল থালাটি এক্ষুনি মিলিয়ে যাবে। এর মধ্যেই উপত্যকায় অন্ধকার নেমে এসেছে। উপত্যকার একপাশে দূর ছুঁয়ে চ'লে গেছে সানোরে আর রোনডা গিরিমালা, অন্য দিকে উষর রুক্ষ ও বিষম কুয়েরভো।

এতক্ষণ তারা এগিয়ে আসছিলো একসঙ্গে, দলে-দলে ; আচম্বিতে তারা থেমে পড়েছে, নিশ্চল। পাহাড়ের চূড়াটাকে দেখায় হাড়-জিরজিরে একটা অশ্বতরের পিঠের মতো—এইমাত্র তার উপরে দেখা দিয়েছে তাদের দলের নেতা। দূরের পাহাড় গ্রেটরকের চূড়ায় সমর-বাহিনীর একটা ঘাঁটি আছে—সেখান থেকে এই পাহাড়ে গাছের তলায় কী হচ্ছে না-হচ্ছে কিছুই দেখা যায় না।

'ব্রিস···ব্রিস,' নেতার গলা শুনেই তারা মুরগির মতো ঠোঁট বাড়িয়ে তীব্র স্বরে শিস দিয়ে উঠেছে।

'ব্রিস···ব্রিস', এই আশ্চর্য বাহিনী একযোগে আবার দিগন্ত জুড়ে তাদের ডাক পাঠিয়ে দিলে।

নেতাটি আশ্চর্য মানুষ। লম্বা, গায়ে বানরের চামড়ার পোশাক—লোমগুলো বেরিয়ে আছে, মাথায় চুলগুলো উসকোখুশকো অবিন্যস্ত, মুখে গজিয়েছে খাটো দাড়ি ; খালি পা, গোড়ালিটা ঘোড়ার খুরের মতো শক্ত।

হাত বাড়িয়ে সে তার বাহিনীকে পাহাড়ের নিচে খাঁজটা দেখালে। সঙ্গে-সঙ্গে পলটনের লোকের মতো—না কি কলের পুতুলের মতো—একযোগে নিখুঁতভাবে হাত বাড়িয়ে তার ভঙ্গির নকল ক'রে দেখালে বাহিনী। নেতা তার হাতটা নামিয়ে নিলে, তারাও হাত নামিয়ে নিলে। নেতা মাটির দিকে ঝুঁকে পড়লো, তারাও হুবহু একভাবেই ঝুঁকে পড়লো মাটিতে। একটা লাঠি তুলে নিয়ে নেতা শূন্যে কেবল নাড়ালে। তারাও হাওয়া-কলের মতো নিজেদের হাতের লাঠি নাড়লে শূন্যে।

তারপরেই নেতাটি ফিরে দাঁড়ালো, ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়লো লাফ দিয়ে, গাছের তলা দিয়ে এগুতে লাগলো বুকে হেঁটে। বাহিনীও তার পিছন-পিছন বুকে-হেঁটে এগুতে লাগলো।

দশ মিনিটও কাটলো না, তারা বৃষ্টি-ভেজা পাহাড়ি রাস্তায় নেমে এলো, কিন্তু, আশ্চর্য, অত বড়ো বাহিনীটা কুচকাওয়াজ ক'রে সমানতালে পা ফেলে এগিয়ে এলো, অথচ তবু একটা পাথর খসলো না রাস্তার।

প্রায় মিনিট পনেরো পরে নেতা হঠাৎ থেমে গেলো; তারাও তক্ষুনি থমকে গেলো; যেন হঠাৎ মাটিতে জ'মে গিয়েছে।

দুশো গজ নিচে শহরটা, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। রাস্তা জুড়ে লোকালয়, অগুনতি আলোই চিনিয়ে দিচ্ছে এলোমেলো বাড়ি-ঘর, বাংলো, ব্যারাকগুলোকে। তারও ওপাশে আরো আলো দেখা যাচ্ছে: সমর-বাহিনীর পোত, সদাগরি জাহাজ, পনটুন—সব নোঙর বাঁধা; আর স্থির জলে পোতগুলোর আলো প'ড়ে চকচক করছে। আরো দূরে, অয়রোপা অন্তরীপের শেষ মাথায়, অন্ধকারের মধ্যে তেকোনা আলো ছড়িয়ে দিয়েছে বাতিঘর।

এমন সময় শোনা গেলো কামানের নিনাদ, 'প্রথম তোপ দাগলো'—লুকোনো গোলন্দাজ বাহিনীর একটা কামান আগুন উগরে দিলে। তারপরেই শোনা গেলো গুমগুমে ঢাকের শব্দ, আর তীক্ষ্ণ ধাতব মস্ত ঝাঁঝরের আওয়াজ।

কাজ শেষ করার প্রহর পড়লো, এখন বাড়ি ফিরে যেতে হবে। কোনো বিদেশী বা কোনো আগন্তুকেরই তারপরে আর বাইরে থাকার হুকুম নেই। কোনো দরকারে বেরুতে হ'লে কেল্লার পলটনকে জানাতে হয়, তারা সঙ্গে লোক দিয়ে দেয়। নাবিকদের জাহাজে ফিরে যাবার সময়ও এটাই। প্রায় সিকি ঘণ্টা পরে-পরেই বেঁধে-বেরুনো সেপাইরা গারদে নিয়ে হাজির করে মাতাল আর ভবঘুরেদের। তারপর আস্তে-আস্তে সব চুপ ক'রে যায়।

দুই চোখের পাতা বুজিয়েই সুখে নিদ্রা যেতে পারেন জেনারেল ম্যাক্যাকমেইল।

সে-রাত্রে ইংল্যাণ্ডের ভয় পাবার কিছু ছিলো না ব'লে মনে হচ্ছিলো। জিব্রালটারের পাহাড় নিরাপদই ঠেকছিলো তখন।

জিব্রালটারের দুর্ধর্ষ পাহাড়ের কথা কে না শুনেছে? যেন কোনো অতিকায় সিংহ গুঁড়ি মেরে ব'সে আছে লাফ মারবার আগে—মুণ্ডুটা তার স্পেনের দিকে ফেরানো, ল্যাজটা আছড়ে পড়েছে সমুদ্রের জলে। দাঁত বেরিয়ে আছে

মুখের—সার বেঁধে দাঁড় করানো আছে সাতশো কামান, নলগুলো উদ্যত—লোকে বলে 'ডাইনিবুড়ির বত্রিশ পাটি'—কিন্তু কেউ আক্রমণ করলে এই বুড়ির দাঁতও কামড় বসাতে জানে!

ইংল্যাণ্ড এখানে দৃঢ়ভাবেই প্রতিষ্ঠিত—যেমন সে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে এডেনে, মলটায়, হঙকঙে; সমুদ্রের দিকে মুখ ফেরানো সবগুলো পাহাড়েরই—যান্ত্রিক অগ্রগতির সুযোগ নিয়ে একদিন সে এইসবগুলোকেই ঘূর্ণ্যমান দুর্গে পরিণত ক'রে ফেলবে।

হারকিউলিসের মুগুর যেখানে অ্যাবিলা আর কাল্‌পের মাঝখানে ছিঁড়ে ফাটিয়ে দিয়ে ভূমধ্যসাগর বানিয়েছিলো সেই পনেরো-মাইল-জোড়া প্রণালীতে ইংল্যাণ্ডের যে-প্রবল প্রতাপ, তা এই জিব্রালটারের জন্যেই।

স্পেনের বাসিন্দারা কি এই উপদ্বীপ ফিরে পাবার আশা ছেড়েই দিয়েছে তাহ'লে? নিশ্চয়। ডাঙা, কিংবা সমুদ্র—দু-দিক দিয়েই জিব্রালটার দুর্ভেদ্য!

কিন্তু ছিলো একজন, যে এই আত্মরক্ষা ও আক্রমণের দুর্ভেদ্য দুর্গটি আবার দখল ক'রে নেবার আশা পোষণ করতো। যে হ'লো এই অদ্ভুত কাহিনীটির নেতা—অদ্ভুত মানুষ—না কি অদ্ভুত খ্যাপা? তার নাম জিন. ব্রালটার। আর এই নাম ব'লেই তার মনে হয়েছে জিব্রালটারকে পুনর্দখল ক'রে নেবার জন্য সে দেশমাতৃকা কর্তৃক আদিষ্ট। তার মাথায় যুক্তি ততটা ছিলো না, যা তাকে ঠেকাতে পারতো। তার উপযুক্ত জায়গা হয়তো ছিলো পাগলা গারদ। নামজাদা ছিলো সে—কিন্তু গত দশ বছর কেউ তার কোনো হদিশ পায়নি—কোথায় যে সে গেছে, কেউ কোনো পাত্তাই পায়নি। চ'লে গেছে তল্লাট ছেড়ে দূরে, বিদেশে? আসলে সে কিন্তু তার পিতৃপুরুষের ভিটে ছেড়েই বেরোয়নি। আদিম মানুষ যেমন ক'রে বনে-পাহাড়ে গুহায়-গহ্বরে দিন কাটাতো, তেমনিভাবেই সে কাটিয়েছে এই দশ বছর। সান মিগেল-এর গুহার গভীরেই তার দিন কেটেছে বেশি। শোনা যায় গুহাটা নাকি একেবারে সমুদ্রের তলায় গিয়ে শেষ হয়েছে। লোকে ভেবেছিলো সে বুঝি ম'রেই গেছে। কিন্তু বেঁচে আছে সে এখনও, জ্যান্ত ও উদ্দীপ্ত—কিন্তু কেমন যেন বর্বরের মতো বেঁচে আছে; মনুষ্যধর্ম লোপ পেয়েছে তার, শুধু জীবের ধর্মই তাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়।

দুই চোখের পাতা বুজেই সুখনিদ্রায় ডুবে ছিলেন জেনারেল ম্যাক্যাকমেইল—যতটুকু তাঁর ঘুমোবার কথা, তার চেয়েও বেশি ঘুমোন তিনি রোজ। লম্বা

হাত, ঝোপের মতো ভুরুর তলায় গোল দুটো কুৎকুতে চোখ, চিবুকে ছুঁচলো দাড়ি, অদ্ভুত সব মুখভঙ্গি, হাত-পা নাড়ার উদ্ধত অভ্যাস, চোয়ালের বহু বিস্তৃত ব্যবহার—সব মিলিয়ে অদ্ভুত কুৎসিত তিনি দেখতে, এমনকি কোনো ইংরেজ জেনারেলের পক্ষেও বড্ড মাত্রাতিরিক্ত কদাকার। বানরেরই কোনো অধস্তন পুরুষ, কিন্তু ওই বানর-মার্কা চেহারা সত্ত্বেও চমৎকার যোদ্ধা।

হ্যাঁ, ওয়াটারপোর্ট স্ট্রিটের সেই মস্ত ও আরামে-ভরা বাড়িতে খুশিতেই কাটান তিনি। আলামেদা তোরণ থেকে ওয়াটারপোর্ট তোরণ পর্যন্ত বাড়ির সামনে দিয়ে বড়ো রাস্তাটা গেছে পেঁচিয়ে। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে কিসের স্বপ্ন ছাখেন তিনি? ইংল্যাণ্ড মিশর দখল ক'রে নিয়েছে? তুর্কিমুলুক, হল্যাণ্ড, আফগানিস্তান, সুদান, বুয়র প্রজাতন্ত্র—এক কথায় ভূমণ্ডলের সব অংশই ইংল্যাণ্ডের পায়ের তলায় হাতজোড় ক'রে ব'সে আছে, এটাই কি তাঁর স্বপ্নের বিষয়? অথচ এখন যখন তিনি সুখনিদ্রায় স্বপ্নভারাতুর, তখন তাঁর সাধের জিব্রালটার বুঝি বেহাত হ'য়ে যায়!

মস্ত আওয়াজ ক'রে তাঁর শোবার ঘরের দরজা সপাটে খুলে গেলো।

'কী হয়েছে?' চীৎকার ক'রে উঠলেন জেনারেল। শব্দ শুনেই তিনি বিছানার উপর খাড়া হ'য়ে বসেছেন।

'সার,' তাঁর খাশ বেয়ারা ওরফে 'এডিকং' প্রায় বোমার মতো ফেটে পড়েছিলো ঘরের মধ্যে, 'শহর আক্রান্ত হয়েছে!'

'স্পেনের লোক?'

'সম্ভবত।'

'তাদের কী দুঃসাহস যে—'

জেনারেল কথাটা শেষ করলেন না, উঠে দাঁড়িয়ে রাতের টুপিটা একটানে খুলে ফেললেন মাথা থেকে, লাফিয়ে গিয়ে গ'লে পরলেন পাৎলুনের মধ্যে, টেনে পরলেন উর্দি, পা গলালেন ভারি বুটজুতোয়, মাথায় শিরস্ত্রাণ চাপিয়ে, কোমরে তলোয়ার বাঁধতে-বাঁধতে বললেন, 'এই শোরগোল কিসের?'

'পাথর পড়ছে, সার, শহরে। আভালাঁশ-এর মতো হুড়মুড় ক'রে একটার পর একটা পাথর নেমে আসছে কেবল।'

'তাহ'লে অনেক হবে তারা সংখ্যায়?'

'হ্যাঁ, সার, তা-ই তো বোধ হচ্ছে।'

'তাহ'লে তীরের সবগুলো ডাকাত আমাদের অজান্তেই গিয়ে ওদের সঙ্গে জুটেছে নিশ্চয়ই, তাক লাগিয়ে দিতে চায় আমাদের—রোনডার সব ফেরারি

জোচ্চোর, সান রোথীর সব জেলে, গাঁয়ের সব উদ্বাস্তু—সব্বাই নিশ্চয়ই একজোট হয়েছে!'

'হ্যাঁ, সার। সেই ভয়ই হচ্ছে।'

'রাজ্যপালকে কেউ খবর দিয়েছে?'

'না, সার। এ-রাস্তা পেরিয়ে অম্বরোপা অন্তরীপে যাওয়াই যাচ্ছে না, ফটকগুলো সব দখল ক'রে নিয়েছে শত্রুরা, রাস্তাগুলো শত্রুসৈন্যে ভর্তি।'

'আর ওয়াটারপোর্ট তোরণের শিবির? সেখানে কি কোনো খবর গেছে?'

'সেখানেও যাওয়া যাচ্ছে না। গোলন্দাজরা সব্বাই নিশ্চয়ই শিবিরে বন্দী হ'য়ে আছে।'

'তোমার সঙ্গে ক-জন লোক আছে?'

'জনা বিশেক হবে, সার—থার্ড রেজিমেন্টের যে-ক-জন লোক আসতে পেরেছে।'

'সান তুনস্তান রক্ষে করুন', জেনারেল ম্যাক্যাকমেইল চীৎকার ক'রে উঠলেন, 'ইংল্যাণ্ডের হাত থেকে আস্ত ইংল্যাণ্ডকেই ছিনিয়ে নিলে কি না··· নিলে কি না কতগুলো কমলা-ফেরি-ক'রে-বেড়ানো লোক! না, কিছুতেই তা হবে না! কিছুতেই না!'

ঠিক সেই মুহূর্তে শোবার ঘরের দরজা আবার খুলে গেলো সশব্দে। ঘরে লাফিয়ে ঢুকলো এক অদ্ভুত জীব—সোজা লাফিয়ে গিয়ে জেনারেলের কাঁধে পড়লো সে।

'আত্মসমর্পণ করো!' গর্জন ক'রে উঠলো সে। এমন একটা ক্রুদ্ধ কান-ফাটানো গর্জন, যেটা মানুষের গলা ব'লে মনে হ'লো না—বরং শোনালো কোনো ক্রুদ্ধ পশুর চীৎকারের মতো।

এডিকং-এর সঙ্গে যে-ক-জন লোক ঢুকেছিলো, তারা এই জীবটির গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়েই বাতির আলোয় তাকে দেখতে পেয়ে আতঙ্কে তিন পা পেছিয়ে এলো।

'জিল ব্রালটার!' চেঁচিয়ে উঠলো তারা।

জিল ব্রালটারই: সেই বন্য মানুষ, সান মিগেলের গুহার সেই আশ্চর্য অদৃষ্ট বর্বরটি, যাকে দীর্ঘকাল কেউ চক্ষে ছাখেনি।

জিল ব্রালটার আবার বন্যপশুর মতো গ'র্জে উঠলো, 'করবে আত্মসমর্পণ?'

'ককখনো না!' উত্তর দিলেন জেনারেল ম্যাক্যাকমেইল।

সৈন্যরা যেই তাকে ঘিরে ফেলছে, তক্ষুনি হঠাৎ একটা তীব্র বিলম্বিত শিস দিয়ে উঠলো জিল ব্রালটার—'স্রিস্।' তক্ষুনি পুরো বাড়িটা 'সেই দুরন্ত বাহিনীতে' ভ'রে গেলো।

বিশ্বাস হয়? বানর এরা, মানুষেরই পূর্বপুরুষ—শ-য়ে শ-য়ে বানর এসে ঢুকেছে এখানে! ইংরেজদের কাছ থেকে জিব্রালটারের পাহাড় এরাই কেড়ে নিতে এসেছে? এরা? যারা এই পাহাড়ের সত্যিকার অধীশ্বর—স্পেনের লোকেরা আসবার আগেই যারা এই পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতো? যখন ক্রমওয়েল ইংল্যাণ্ডের হ'য়ে এটাকে দখল ক'রে নেবার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি, তখন যারা ছিলো এখানকার আদি বাসিন্দা।

হ্যাঁ তারাই! আর তাদের সংখ্যাই তাদের দুর্ধর্ষ ক'রে তুলেছে—এই ল্যাজহীন বানরগুলোর উৎপাত সহ্য ক'রেই এখানে মানুষকে থাকতে হয়, না-হ'লে রক্ষা থাকে না। এই ধূর্ত, উদ্ধত, ক্ষিপ্র জন্তুগুলোই জিল ব্রালটারের বাহিনী, যাদের কেউ স্পর্শ করতেও সাহস পায় না, কারণ একবার কারুর গায়ে চোট লাগলে লোকে দেখেছে একের পর এক মস্ত পাথর গড়িয়ে ফেলে তারা নিষ্ঠুরভাবে প্রতিশোধ নেয়!

আর যখন এরাই এসেছে দল বেঁধে, ঝাঁকে-ঝাঁকে, আর এদের চালিয়ে নিয়ে এসেছে এক আস্ত উন্মাদ, যে এদের মতোই হিংস্র, ভীষণ আর খ্যাপা—এই জিল ব্রালটার, যাকে তারা চিনতো, যে এই বানরদের মতোই স্বাধীনভাবে বিচরণ করতো এখানে, এই চারপেয়ে হ্বিলহেল্‌ম টেল, যে সারা জীবন ধ'রে কেবল এই কথাই ভেবেছে, কী ক'রে স্পেনের মাটি থেকে বিদেশী আক্রমণকারীদের হঠিয়ে দেয়া যায়।

চেষ্টা যদি সফল হয়, তবে কী লজ্জা! কী লজ্জা! কোথাও মুখ দেখাবার জায়গা থাকবে না ইংল্যাণ্ডের! হিন্দুদের তারা জয় করেছে, জয় করেছে হাবশিদের, হারিয়ে দিয়েছে তাশমানিয়ার মানুষদের, অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসীদের, হটেনটটদের, আরো, আরো কত কাউকে—আর শেষকালে তাদের উপর টেক্কা দিয়ে জিতে যাবে কিনা কতগুলো বানর!

এ রকম বিপত্তি যদি কখনও হয়, তাহ'লে জেনারেল ম্যাক্যাকমেইল রিভলভারের গুলিতে নিজের মাথার খুলি নিজেই উড়িয়ে দেবেন। এই লজ্জা তিনি সইবেন কী ক'রে?

নেতার শিস শুনে বানররা ঘরে ঢোকবার আগেই কয়েকটি সৈন্য জিল ব্রালটারের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলো! উন্মাদ জিল ব্রালটার—তার গায়ে

তখন অমানুষিক শক্তি—ঝটাপট করতে লাগলো। তবু সব্বাই মিলে অনেক কষ্টে তাকে কাবু ক'রে ফেললে, বানরের চামড়ার পোশাকটা টেনে ছিঁড়ে ফেলা হ'লো, তার গা থেকে, প্রায় উলঙ্গ ক'রে তাকে একটা কোণায় ঠেশে রাখা হলো,—নগ্ন, মুখে কাপড় পোরা, হাত-পা বাঁধা—নড়বার শক্তি নেই, আওয়াজ করার ক্ষমতা অন্তর্হিত। তার একটু পরেই জেনারেল ম্যাক্যাক-মেইল বেরিয়ে এলেন বাড়ি থেকে—হয় জিতবেন, নয় তো হারবেন, সেরা যোদ্ধার মতো এই তাঁর ভীষণ পণ।

বাইরেও বিপদ মোটেই কম নেই। সৈন্যদের কয়েকজনে শেষটায় পালটা আঘাত হানতে পেরেছে, বোধহয় ওয়াটারপোর্ট তোরণের কাছেই ফিরে দাঁড়িয়েছিলো প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়ে—এখন তারা জেনারেলের বাড়ির দিকে ছুটে আসছে। বাজারে আর ওয়াটারপোর্ট স্ট্রিটে কয়েকটা বন্দুকের শব্দ শোনা গেলো। তবু বানররা সংখ্যায় এতই বেশি যে জিব্রালটারের দুর্গ প্রায় বেহাত হ'য়েই যায় আর কি—সৈন্যরা পিছোবার জোগাড় করছে। এখন যদি এস্পানিয়রাও বানরদের সঙ্গে হাত মেলায়, তো সব ছেড়েছুড়ে স'রে পড়তে হবে—কেল্লা, শিবির, ছাউনি—কোথাও কোনো সৈন্যই থাকবে না, সব প'ড়ে থাকবে ফাঁকা ও প্রতিরোধহীন।

হঠাৎ পুরো অবস্থাটাই সম্পূর্ণ পালটে গেলো।

মশালের আলোয় দেখা গেলো বানরসেনা কেবলই পিছিয়ে যাচ্ছে। তারা যে পিছোচ্ছে, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। যান্ত্রিকভাবে কুচকাওয়াজ ক'রে তারা ফিরে যাচ্ছে, সবচেয়ে আগে রয়েছে তাদের নেতা, লাঠি উঁচিয়ে। আর বাকি বানররাও হুবহু নকল করছে তাকে—তেমনি ছুটে-ছুটে শহর ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে।

তাহ'লে কি বাঁধন ছিড়ে বেরিয়ে পড়েছে জিব্রালটার? যে-ঘরে তাকে বন্দী ক'রে রাখা হয়েছিলো, সেখান থেকে তাহ'লে সে পালিয়ে এসেছে? সন্দেহ কী! কিন্তু কোথায় যাচ্ছে সে এখন? যাচ্ছে কি অয়রোপা অন্তরীপের দিকে? রাজ্যপালের বাড়িতে গিয়ে চড়াও হবে তাহ'লে? বলবে তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে?

না! সেই উন্মাদ তার বাহিনী নিয়ে ওয়াটারপোর্ট স্ট্রিট ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে। আলামেদা তোরণ পেরিয়ে তারা এঁকে-বেঁকে পার্কটা পেরিয়ে গিয়ে পাহাড়ের ঢালে পড়লো।

এক ঘণ্টা পরে আর একটি আক্রমণকারীও রইলো না জিব্রালটারে।

হয়েছে কী তাহ'লে?

পরে সেটা খোলাখুলি বোঝা গেলো, যখন জেনারেল ম্যাক্যাকমেইল এসে দেখা দিলেন পার্কে।

তিনি—তি নি ই সেই উন্মাদের ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনিই তাদের চালিয়ে নিয়ে গেছেন শহর ছেড়ে পাহাড়ের কোলে। সেই বানরের চামড়াটা গায়ে জড়িয়ে নিয়েছিলেন তিনি। দেখতে একেই তো বানরের মতো—কাজেই বানরসেনাকে ঠকাতে তাঁর বেগ পেতে হয়নি। কেবল গিয়ে দাঁড়িয়েছেন তিনি রাস্তায়, তিনি, ইংল্যাণ্ডের প্রতিনিধি, আস্ত এক নরবানর, আর বানর-সেনা তাঁর অনুসরণ করেছে।

প্রতিভার বিদ্যুৎবিকাশ, যাকে বলে। সেই জন্যেই সেণ্ট জর্জের ক্রুশ পাবেন তিনি।

আর জিল ব্রালটার? ইংল্যাণ্ড তাকে নগদ দামে বেচে দিলে এক সার্কাসের দলকে—তারা তাকে ইয়োরোপ আর আমেরিকায় দেখিয়ে টাকা লুঠে নিলে। সার্কাসওলা এমনকি এ-কথাও রটিয়েছিলো যে, সে সান মিগেলের বন্য মানুষকে দেখাচ্ছে না, দেখাচ্ছে স্বয়ং জেনারেল ম্যাক্যাকমেইলকে।

কিন্তু ইংরেজ সরকারের টনক নড়বার পক্ষে একরাতের এই আক্রমণই যথেষ্ট হ'লো। সরকার বুঝতে পারলে যে মানুষ আর এটাকে দখল করতে পারবে না, বানরের দয়ার উপর নির্ভর ক'রে আছে জায়গাটা। আর তাই ইংল্যাণ্ড—তার ব্যাবহারিক বুদ্ধি তো জগৎবিখ্যাত—ঠিক করলে যে, ভবিষ্যতে সেখানে সবসময়েই সবচেয়ে কুৎসিত দেখতে লোককে জেনারেল ক'রে পাঠাবে—যাতে বানররা আরেকবারও ঠ'কে যায়।

কেবল এই সাবধানতার উপরেই জিব্রালটারের কর্তৃত্ব তারা বজায় রেখে দেবে।

মাস্টার জাকারিয়ুস

১

হিমরাত্রি

জেনিভা হ্রদেরই একেবারে পশ্চিম উপান্তে জেনিভা নগরী। হ্রদের থেকে বেরিয়েছে রোন নদী; নগরীকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছে সে; কিন্তু হঠাৎ নগরীর মাঝখানে সে নিজেই আবার দুইভাগে ভাগ হ'য়ে গেছে—মাঝনদীতে ছোট্ট একটা দ্বীপ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ব'লে। শিল্প-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রগুলিতে অনেক সময়েই এই ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ করা যায়। যাতায়াতের যে-সুবিধে এই চঞ্চল স্রোত উপহার দেয়, প্রথম বাসিন্দারা যে তাতেই যথেষ্ট প্রভাবিত হ'য়ে পড়ে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 'নিজে থেকেই চলতে থাকে এই রাস্তা,' নদীদের পাস্‌কাল তো এই ভাবেই বর্ণনা করেছেন। রোন নদীর বেলায় বলা যায় এ-রাস্তা কেবল চলে না, ছুটে চলে—দৌড়ে চলে।

দ্বীপটা যেন ওই নদীর মধ্যকার মস্ত এক ওলন্দাজ নৌকো। নিয়মিতভাবে নতুন-নতুন বাড়ি-ঘর তৈরি হবার আগে অদ্ভুতধরনে বাড়ি বানানো হ'তো এখানে—যেন একটা আরেকটার গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তো তারা, বিশৃঙ্খল কিন্তু সুন্দর, এলোমেলো অথচ মনোরম। নদীর একেবারে পাড় ঘেঁষে উঠছে বাড়ি, মনে হয় যেন নদীর মধ্যেই তার ভিত, যেন থামের গায়ে কোনোরকমে হেলানো আছে—আর চঞ্চল নদীস্রোতের মধ্যে এলোমেলো সেই বাড়িগুলি যেন হঠাৎ কেমন ক'রে আটকে গেছে, না-হ'লে তারাও হয়তো ভেসে যেতো দূরে। মস্ত-মস্ত সব থামগুলিকে কোনো অতিকায় কাঁকড়ার দাঁড়া ব'লে মনে হয়—কালো হ'য়ে গেছে তারা দিনে-দিনে, আর জল তাদের খেয়ে-খেয়ে গেছে—দেখে অদ্ভুত ও অবাস্তব একটা শিরশিরে অনুভূতি হয়। পুরোনো ভিতের মধ্যে ছোট্ট হলুদ জলের স্রোত খেলা করে অন্ধকারে, যেন কোনো ঊর্ণনাভের সুতো বেরিয়েছে কেঁপে-কেঁপে, যেন কোনো মস্ত ওক-বনের চঞ্চল পাতা তারা—আর জল এই স্তম্ভের অরণ্যে আটকে, বাধা পেয়ে, ধাক্কা খেয়ে, অসীম দুঃখে গ'র্জে-গ'র্জে ফেনিয়ে উঠছে।

দ্বীপের বাড়িগুলোর মধ্যে একটি এত পুরোনো ও জীর্ণ যে তাকাবামাত্র

প্রথমেই চোখে পড়ে। বুড়ো ঘড়ি-নির্মাতা মাস্টার জাকারিয়ুসের বাড়ি এটা; থাকার মধ্যে আছে তাঁর একমাত্র কন্যা জের্‌াদ; সে ছাড়া ওই বাড়িতে থাকে তাঁর ছাত্র ও সহকারী ওবের তুন, আর পুরোনো দাসী স্কলাষ্টিকা।

এই জাকারিয়ুসের সঙ্গে কোনোদিক থেকেই তুলনা চলে এমন কেউ জেনিভায় ছিলো না। কত যে তাঁর বয়েস, কেউ তা জানেই না। শহরের প্রাচীনতম লোকটি পর্যন্ত এ-কথা বলতে পারবে না কবে থেকে তার কাঁধের উপর লম্বাটে ধরনের তীক্ষ্ণ মাথাটি চঞ্চলভাবে নড়াচড়া করছে কিংবা এটাও কেউ বলতে পারবে না কবে তাঁকে প্রথম এই শহরের রাস্তায় হাঁটতে দেখা গেছে—লোকে শুধু এটুকুই জানে যে যখন তিনি পথে বেরোন, হাওয়ায় তাঁর শাদা চুল এলোমেলোভাবে ওড়ে। তিনি যেন আদৌ বেঁচে নেই: শুধু তাঁর ঘড়িগুলির পেনডুলামের মতো সর্বদাই যেন আন্দোলিত হচ্ছেন। ছোটো-খাটো অলবড্যে শরীর তাঁর, সব সময়েই গাঢ় ও 'গম্ভীর' রঙের পোশাক পরেন—কালোই বেশির ভাগ সময়। লেয়োনার্দো দা ভিন্‌চির ছবির মতো যেন আদ্যোপান্ত কালো রঙেই আঁকা তিনি।

গোটা বাড়িটার মধ্যে যে-ঘরটা সবচেয়ে ভালো আর সুন্দর, সেই ঘরে থাকে জের্‌াদ; ঘুলঘুলির মতো ছোট্ট এক টুকরো জানালা দিয়ে জুরা পর্বতের তুষারঢাকা আশ্চর্য চূড়াটি দেখা যায়। কিন্তু জাকারিয়ুসের শোবার ঘর আর কারখানা যেন জলের গায়ে লাগা গহ্বরের মতো—মেঝেয় পাটাতন ফেলা, তলায় জলের স্রোত ছলোছলো ঘুরে বেড়ায়।

মনেই পড়ে না কবে থেকে, কিন্তু এটা সত্যি যে খাবার সময় ছাড়া মাস্টার জাকারিয়ুস কখনো তাঁর ঘর থেকে বেরোন না—শুধু মাঝে-মাঝে যখন শহরের বিভিন্ন ঘড়িগুলোকে দম দিতে যেতে হয়, তখন অবশ্য অন্য রকম। সারা সময়ই তিনি তাঁর বেঞ্চির উপর ব'সে কাটান: আশপাশে ঘড়ির অসংখ্য সূক্ষ্ম ও জটিল যন্ত্রপাতি ছড়িয়ে থাকে—আর এখানে বলা উচিত যে এইসব যন্ত্রের অধিকাংশই তাঁর নিজের আবিষ্কার। আশ্চর্য তাঁর মেধা আর চাতুরী; আলেমান ও ফরাশি দেশে তাঁর কাজের অত্যন্ত সুখ্যাতি। জেনিভার শ্রেষ্ঠ ঘড়িনির্মাতারা অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর শ্রেষ্ঠতা বুঝতে পেরেছিলো। তিনি যে নগরীর একজন সম্মান, এটা স্পষ্টভাবে বলেছিলো তখন; 'ঘড়ির যে-অংশটা গতি নিয়ন্ত্রণ করে, তা আবিষ্কার করার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তাঁর।' সত্যি-বলতে, সত্যিকার ঘড়ির জন্মই হ'লো তখন, যখন কয়েক বছর আগে জাকারিয়ুসের প্রতিভা নানা সূক্ষ্ম জিনিষ আবিষ্কার করলো।

অনেকক্ষণ ধ'রে কঠোর ও একটানা কাজ করার পর আস্তে জাকারিয়ুস তাঁর যন্ত্রপাতি সরিয়ে রাখেন ; আতশকাচ দিয়ে দেখেদেখে সূক্ষ্ম ও জটিল যন্ত্রগুলি জুড়ছিলেন তিনি এতক্ষণ—এবার তাঁর লেদ-এর সচল চাকাটা তিনি বন্ধ ক'রে ফ্যালেন ; তারপর মেঝের পাটাতনের চোরা দরজাটার পাল্লা তুলে ঝুঁকে দাঁড়ান তিনি ; নিচে তাঁর চোখের তলায় রোন নদীর প্রখর স্রোত আবর্ত তুলে ছুটে যাচ্ছে—ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওইভাবে দাঁড়িয়ে সেই ভিজে ও ঘন বাষ্প নিশ্বাসে টেনে নেন বুকে।

একদিন শীতের রাত্রে স্কলাষ্টিকা যথারীতি খাবার টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিলে ; বাড়ির রীতি অনুযায়ী তরুণ যন্ত্রশিল্পী ওবের আর সে দুজনেই প্রভুর সঙ্গে খেতে বসে। জাকারিয়ুসের খাদ্য অত্যন্ত সাবধানে রান্না করা হয় ; সে-রাতে কিন্তু সুন্দর নীল রেকাবিতে সাজিয়ে দেয়া খাদ্যবস্তু তিনি স্পর্শই করলেন না। কন্যা জের্‌াদের মিষ্টি কথাগুলির উত্তরে সংক্ষেপে হু-হাঁ্যা ক'রে যাচ্ছিলেন কিংবা কখনো কোনো কথাই বলছিলেন না। জের্‌াদের কথা থেকে বোঝা গেলো যে বাবার এই অদ্ভুত স্তব্ধতা সে স্পষ্ট লক্ষ করেছে। এমনকি স্কলাষ্টিকার একঘেয়ে ও অবিরাম বকুনিতে পর্যন্ত তিনি কোনো কান দিলেন না ; রোন নদীর অবিশ্রাম কলরোলের সঙ্গে স্কলাষ্টিকার মুখরতার যে কোনো তফাৎ তিনি ধরতে পেরেছেন, এটা তাঁর মুখ দেখে মনে হ'লো না।

চুপচাপ খেয়ে উঠে জাকারিয়ুস কাউকেই শুভরাত্রি না-জানিয়ে তাঁর কুঠুরিতে চ'লে গেলেন ; অন্যদিন খাওয়া-দাওয়ার পর কন্যাকে আলিঙ্গন ক'রে সস্নেহে তার কপালে চুম্বন করেন তিনি ; কিন্তু আজ তাও করলেন না, বরং তিনি যখন দরজার বাইরে চ'লে গেলেন তখন তাঁর ভারি পায়ের তলায় সিঁড়িটা আর্ত গলায় কেবল কাৎরে-কাৎরে উঠলো।

জের্‌াদ, ওবের আর স্কলাষ্ট্রিকা—তিনজনেই স্তব্ধ ব'সে রইলো কিছুক্ষণ। সন্ধে থেকেই আকাশ মেঘলা হ'য়ে আছে, কেমন যেন বিমর্ষ আর মলিন ; কোনো রকমে নিজেদের টেনে-হিঁচড়ে আল্পসের চূড়ো পর্যন্ত যেতে পেরেছে যেন ভারি মেঘগুলি—তারপর অবসন্ন হ'য়ে সেখানেই ব'সে আছে, কালো ও গম্ভীর ; আর 'বৃষ্টি হবে,' এই কথাই জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ভিজে হাওয়া। সুইৎজারল্যাণ্ডের প্রবল বর্ষণকাল যেন মন খারাপ করিয়ে দেয় কেবল—রাশিরাশি বিষাদ যেন ছড়িয়ে দেয় সে চারদিকে। সেই থেকে বাড়ির চারপাশে ভীষণ দখিনা বাতাস গজরাচ্ছে, আর তার তীক্ষ্ণ শিসের মধ্যে যেন ভিড় ক'রে আছে অলুক্ষুণে সব আশঙ্কা।

অবশেষে স্কলাষ্টিকাই প্রথমে স্তব্ধতা ভাঙলো। জের্‌াঁদের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কর্তা আজ ক-দিন থেকেই যেন কেমন হ'য়ে আছেন।' মাতা মেরির নামে শপথ উচ্চারণ করলে সে। খাদ্যে যে তাঁর কোনো স্পৃহা নেই—তা তো স্পষ্ট। বোধহয় অনেক কথা তাঁর ভিতরে ভিড় ক'রে আছে—অথচ সেগুলি যে কী, তা বের ক'রে আনতে গেলে অতি ধূর্ত-কোনো শয়তানও একেবারে হিমশিম খেয়ে যাবে।

'গোপন কোনো উদ্বেগ রয়েছে নিশ্চয়ই। অথচ উদ্বেগের কারণ যে কী তা তো কিছুই বুঝতে পারছি না,' গভীর উৎকণ্ঠা ও বিষাদ ফুটে উঠলো জের্‌াঁদের মুখচোখে।

'এত মন খারাপ করবেন না, মাদমোয়াজেল। মাস্টার জ়াকারিয়ুসের স্বভাব তো জানেনই আপনি। তাঁর মনের মধ্যে যে কী আছে, তা কি কোনোদিনই কেউ টের পেয়েছে? হয়তো আজ অত্যন্ত ক্লান্তি অনুভব করছিলেন, দেখবেন, কাল যার চিহ্নমাত্রও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আপনি কষ্ট পেয়েছেন জানলে তখন হয়তো আবার অত্যন্ত দুঃখিত হ'য়ে পড়বেন। জের্‌াঁদের আশ্চর্য আয়ত চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে বললো ওবের।

ওবের-এর বুদ্ধি বিবেচনা ও সততা জ়াকারিয়ুসের ভালো লেগেছিলো ব'লেই তাকেই তিনি প্রথম নিজের হাতে কাজ শেখাতে রাজি হয়েছিলেন— ওবের ছাড়া আর-কাউকেই তিনি কখনো তাঁর বিশেষ কর্মপদ্ধতি শেখাতে চাননি। ওবেরের প্রতি এখন জের্‌াঁদ এমনি আসক্ত হ'য়ে পড়েছে যে তাঁর নিষ্ঠা সম্বন্ধে এখন কোনো প্রশ্নই আর ওঠে না।

জের্‌াঁদের বয়স আঠারো বছর। গোল ছাঁদের মুখ তার—মাদোন্নার মতো সরল আর স্বর্গীয় যেন, যে-স্নিগ্ধ শুচিতা এখনও ব্রিটানিয়ার কোনো-কোনো প্রাচীন শহরের রাস্তায়-ঘাটে দৈবাৎ চোখে পড়ে। চোখ দুটিতে ছড়িয়ে আছে অসীম সরলতা। কোনো কবির স্বপ্ন-মাধুরীর প্রতিমা যেন সে, আর তা-ই তাকে ভালো না-বেসে কোনো উপায় নেই। তার পোশাকের রঙ স্নিগ্ধ ও সুকুমার— তাতে কোনো তীব্র কর্কশ চীৎকার নেই; গির্জের রেশমে যে-স্নিগ্ধতার আভা চোখে পড়ে, তেমনি শুভ্র বসনে তার সুডৌল কাঁধখানি ঢাকা। জেনিভায় তো এখনও কালভিনবাদের শুষ্কতা ছড়িয়ে পড়েনি—আর জের্‌াঁদ যেন তারই মধ্যে কোনো অতীন্দ্রিয় জগৎ খুঁজে পেয়েছে?

লাতিন স্তোত্র পাঠ করে সে রাত্রে আর সকালে; সম্প্রতি আবার ওবের তুনের মধ্যে গোপন মমতা আবিষ্কার করেছে সে—তার প্রতি এই তরুণ

যন্ত্রশিল্পীর অনুরাগের প্রবলতা তার আর অজানা নেই। এই বৃদ্ধ ঘড়িনির্মাতার বাড়িটাই যেন ওবেরের সমস্ত জগৎ ; নিজের কাজ শেষ হ'য়ে গেলে জাকারিয়ুসের কারখানা থেকে বেরিয়ে আসে সে, বাকি সময়টা এই তরুণীর কাছেই কাটিয়ে দেয়, পারতপক্ষে বাড়ি ছেড়ে এক পা-ও বোরায় না।

বুড়ি দাসী স্কলাস্টিকা দেখেছিলো সবই, কিছুই বলতো না। দিনকাল যে বড্ড খারাপ হ'য়ে গেছে, আর গৃহস্থালির টুকিটাকি তা আসলে মোটেই ফ্যালনা নয়—তার যাবতীয় বকবকানি এতেই নিঃশেষ হ'য়ে যেতো। একবার সে যদি কোনো বিষয়ে বকবক শুরু করে, তো তার আর বিরাম নেই, এই তথ্যটা সবাই জানতো ব'লেই কেউ তাকে আর থামাবার চেষ্টা করতো না। জেনিভায় যে কলের বাজনা-ওলা নস্যিদানি তৈরি হয়, সে যেন তা-ই। একবার চাবি দিলে, হাতুড়ির বাড়ি মেরে কেউ তাকে ভেঙে না-ফেললে, সমস্ত দম ফুরিয়ে না ফেলে, কিছুতেই সে থামবে না।

জের াদকে অমন স্তব্ধ ও বিষণ্ন হ'য়ে পড়তে দেখে স্কলাস্টিকা তার পুরোনো কাঠের চেয়ারটা ছেড়ে উঠে গেলো ; মস্ত একটা রুপোর পিলশুজে মস্ত একটা মোমবাতি জ্বেলে পাথরের কুলুঙ্গির মধ্যে গালার তৈরি মেরিমাতার প্রতিমার পাশে বসিয়ে দিলে। গৃহস্থালির অধিষ্ঠাত্রী এই মাদোন্না মূর্তির কাছে নতজানু হ'য়ে বসাই ছিলো বাড়ির নিয়ম ; তিনি যাতে দয়া ক'রে আসন্ন রাত্রিকালে সবাইকে ছাখেন, ঘুমোতে যাবার আগে এই প্রার্থনা করতে হয় তাঁর কাছে। জের াঁদ কিন্তু আজ চুপ ক'রে তার চেয়ারেই ব'সে রইলো।

'বাঃ,' স্কলাস্টিকা অবাক হ'য়ে গেলো, 'খাওয়া শেষ হ'য়ে গেছে, শুতে যাবার সময়ও হ'লো—অত রাত অবধি জেগে থেকে খামকা চোখকে কষ্ট দিচ্ছো কেন? হায়, মেরি মাতা। এর চেয়ে ঘুমিয়ে থাকা অনেক ভালো—তাহ'লে অন্তত স্বপ্নে কিছুটা আরাম পাওয়া যাবে। দিনকাল যেমন জঘন্য হ'য়ে পড়েছে, তাতে সুখশান্তি পাবার কি আর জো আছে আজকাল?'

'বাবার জন্য ডাক্তার ডাকা উচিত না আমাদের?' জিজ্ঞেশ করলো জের াঁদ।

'ডাক্তার!' বুড়ি দাসী প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, 'ডাক্তার-বদ্যির বড়ো-বড়ো কথাবার্তা আর খেয়ালে কত্তা কি কোনোদিনও কান দিয়েছেন? বরং ঘড়িকে দামি ওষুধ খাওয়াবেন—কিন্তু নিজে? ককৃখনো না!'

'কী করবো তাহ'লে?' আপন মনেই বললো জের াঁদ, 'বিশ্রাম নিচ্ছেন, না কাজ করছেন, কে জানে?'

'জের্যাদ,' ওবের নরম স্বরে বললে, আপনার বাবা একটু ভাবনায় পড়েছেন, এইমাত্র—আর কিছুই তাঁর হয়নি।'

'আপনি জানেন, ওবের, কী সে ভাবনা ?'

'বোধহয় জানি, জের্যাদ। অন্তত আন্দাজ করতে পারি।'

'তাহলে ব'লে ফ্যালো তো চটপট,' অত্যন্ত উৎসুকভাবে ব'লে উঠলো স্কলাষ্টিকা। পয়সা বাঁচাবার জন্য মোমবাতিটা সে নিভিয়ে দিলে।

'জের্যাদ,' ওবের বললে, 'দিন কয়েক ধরে অদ্ভুত কতগুলি প্রহেলিকার মতো ব্যাপার ঘটেছে। আপনার বাবা কয়েক বছর ধ'রে যে-ঘড়িগুলি বানিয়ে বিক্রি করেছিলেন, সব হঠাৎ এক-এক ক'রে বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে। সারাবার জন্যে অনেকে ঘড়িগুলি তাঁকে দিয়ে গেছে। অত্যন্ত সাবধানে তিনি ঘড়িগুলি খুলেছেন। স্প্রিং-এ কোনো দোষই নেই, চাকা আর কাঁটাগুলিও ঠিক আছে—তবু আরো সাবধানে ভালো ক'রে দেখেশুনে তিনি আবার জুড়ে দিয়েছেন সেগুলি। কিন্তু তাঁর সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও একটা ঘড়িও আর চলছে না।'

'নিশ্চয়ই কোনো শয়তানের কাণ্ড!' স্কলাষ্টিকা চেঁচিয়ে উঠলো।

'এ-কথা কেন বলছো ?' জের্যাদ জিজ্ঞেশ করলো। 'আমার কাছে তো ব্যাপারটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব'লে বোধ হচ্ছে। জগতে তো আর চিরকাল কিছুই থাকে না। মানুষ কি আর অসীমকে স্পর্শ করতে পারে ?'

'কিন্তু তবু এটা ঠিক যে,' ওবের বললে, 'ব্যাপারটা কেবল রহস্যময় নয়, অসাধারণও। ঘড়িগুলি হঠাৎ কেন বিকল হয়ে গেলো, আমিও তাঁর সঙ্গে তা তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোথাও কোনো গোলমাল চোখে পড়েনি। হতাশ হ'য়ে কতবার যে হাল ছেড়ে দিয়েছি তার কোনো ইয়ত্তা নেই।'

'তা এমন-একটা অর্থহীন কাজ করারও চেষ্টা কেন, বাপু ?' স্কলাষ্টিকা বললে, 'ওই তামার কলটা নিজে থেকেই চলবে, সময় ব'লে দেবে, জানিয়ে দেবে এমনকি ঘণ্টা মিনিট সেকেণ্ড—তাকে কি স্বাভাবিক বলে ? এর চেয়ে আমাদের ছায়া-ঘড়িই ঢের ভলো ছিলো।'

'যখন শুনবে যে কেন ওই ছায়া-ঘড়ি বের করেছিলো,' ওবের বললে, 'তখন তুমি আর ও-কথা বলবে না।'

'হা ঈশ্বর! এ আবার কী কথা শোনালে।'

'তোমার কি মনে হয়,' অত্যন্ত সরলভাবে শুধোলে জের্যাদ, 'বাবার ঘড়িগুলি যাতে ঠিকমতো চলে, সেজন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা উচিত আমাদের ?'

'নিশ্চয়ই', তৎক্ষণাৎ বললো ওবের।

'ভালো, কিন্তু এই প্রার্থনায় কোনো ফল হবে না', স্কলাষ্টিকা আপন মনে বিড়বিড় করলে, 'তবে উদ্দেশ্য ভালো ব'লে ভগবান এদের ক্ষমা করবেন।'

আবার জ্বালানো হ'লো মোমবাতি। স্কলাষ্টিকা, জের্ঁাদ আর ওবের মেঝেয় নতজানু হ'য়ে বসলো একসঙ্গে। জের্ঁাদ প্রথমে প্রার্থনা করলো রাত্রির জন্য করুণা ও আশিস, প্রার্থনা করলো বন্দী আর পথিক, ভালো আর মন্দ সকলের জন্য, আর সবশেষে তার বাবার এই দুর্ভাগ্যের জন্য সবচেয়ে কাতরভাবে মিনতি জানালে সে।

ভগবানের কাছে সব দুঃখ নিবেদন ক'রে দিলো ব'লে প্রার্থনার পরে যখন তারা তিনজন উঠে দাঁড়ালো, তখন তাদের মনে বেশ খানিকটা আস্থা জেগে উঠেছে।

ওবের নিজের ঘরে চ'লে গেলো ; জের্ঁাদ একা জানলার পাশে ব'সে-ব'সে কী যেন ভাবতে লাগলো, আর আস্তে-আস্তে রাস্তায় শেষ বাতিগুলো নিভে গেলো ; স্কলাষ্টিকা প্রথমে চুল্লির নিভু-নিভু অঙ্গারে একটু জল ছিটিয়ে দিলে, তারপর দরজার মস্ত খিল দুটি লাগিয়ে দিয়ে বিছানায় গিয়ে গড়িয়ে পড়লো—আর শয়তানের ভয়েই ম'রে যাচ্ছে ব'লে সে স্বপ্ন দেখতে লাগলো পরক্ষণে।

ক্রমেই বাড়তে লাগলো শীতের রাতের বিভিষিকা ও আতঙ্ক। মাঝে-মাঝে নদীর আবর্তের সঙ্গে কন্‌কনে ঝোড়ো হাওয়া এসে মেশে, আর সারা বাড়িটা থরথর ক'রে কেঁপে ওঠে ; জের্ঁাদ কিন্তু তেমনি ঠায় ব'সে আছে জানালায়, বিষণ্ণ ও একা—বাবার চিন্তায় মগ্ন ও তন্ময়। ওবেরের কাছ থকে শোনবার পর থেকে বাবার উদ্বেগ আর অসুখ ক্রমেই অতিকায় আর ভয়ংকর রূপ নিচ্ছে ব'লে তার মনে হ'লো। তার বাবার যেন জীবন কেমন যান্ত্রিক হ'য়ে গেছে—এবং এ-কথা ভাবতে তার অত্যন্ত কষ্ট হ'লো বটে, তবু সে অনুভব করলে যে, যে-খুঁটির উপর ভর ক'রে তাঁর জীবন ঘুরে চলতো, তা যেন ক্রমেই জীর্ণ হ'য়ে পড়ছে—আগের মতো তেমন সহজ ও অনায়াস ভাবটা যেন আর নেই।

হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়ায় ছাদের চিলেকোঠার জানলার পাল্লাটা প্রচণ্ডভাবে দেয়ালে গিয়ে লাগলো। যেন ভীষণ ঘা খেয়ে জের্ঁাদ শিউরে তার স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলো, কিন্তু আওয়াজটার উৎস সে ধরতে পারলো না। একটু যখন শিহরণ কমলো, ধীরে-ধীরে সে জানলার শার্শি খুলে দিলে। চিরে, ফেটে চুরমার হ'য়ে গেছে যেন মেঘ, আর মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে আশপাশের বাড়ির ছাতে। জানলা দিয়ে ঝুঁকে সে খড়খড়িটা টেনে দেবার চেষ্টা করলে, কিন্তু

হঠাৎ কেমন যেন ভয় করে উঠলো, কেমন যেন একটা ছমছমে ভাব।

মনে হ'লো বৃষ্টি আর নদীর জলে একাকার হ'য়ে গেছে চারদিক, যেন প্লাবন শুরু হ'য়ে গেছে হঠাৎ, জীর্ণ বাড়িটা বুঝি আস্ত ডুবে যাচ্ছে জলে। নড়বোড়ে কাঠ আর পাটাতন কাতর আর্তনাদ ক'রে উঠছে বারে-বারে। ভয় পেয়ে সে তার ঘর ছেড়েই বুঝি পালাতো, কিন্তু এমন সময় হঠাৎ জাকারিয়ুসের শোবার ঘরে সে আলোর রেশ দেখতে পেলে। কোনো-কোনো সময় আদিম দেবতাদের গর্জন আমাদের কানে পৌঁছোয় না, বরং তার চেয়ে অনেক মৃদু ও অস্ফুট শব্দ ঝড়ের মধ্যে অতিকায় হ'য়ে ওঠে। হঠাৎ যেন কোন অস্ফুট বিলাপের ধ্বনি তার কানে এসে পৌঁছোলো। জানলাটা বন্ধ করার চেষ্টা করলো সে, কিন্তু পারলো না। ঝোড়ো হাওয়ায় যেন বারে-বারে ঠেলে দিচ্ছে তাকে, লুকিয়ে বাড়িতে ঢোকবার সময় চোরকে যেভাবে বাড়ির দরজা-জানলা ঠেলে ফেলে দিতে চায়।

মনে হ'লো আতঙ্কে সে বুঝি পাগল হ'য়ে যাবে। এত রাতে কা করছেন তার বাবা? দরজা খুললো সে, কিন্তু কবাটটা তার হাত থেকে স'রে গেলো ঝোড়ো হাওয়া তাকে ভীষণ জোরে ধাক্কা দিয়ে ছুঁড়ে ফেললো দেয়ালে। অন্ধকার খাবার ঘরে এসে দাঁড়ালো জের্যাদ, তারপর কোনোরকমে পা টিপে-টিপে মূর্ছিত ও বিবর্ণর মতো বাবার কারখানার দিকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলো।

নদীর গর্জনে আর চীৎকারে আস্ত ঘরটা কেঁপে-কেঁপে উঠছে আর তার মাঝখানে সোজা দাঁড়িয়ে আছেন বৃদ্ধ ঘড়িনির্মাতা। কেমন এক জ্যান্ত বিভীষিকার মতো তাঁর শাদা চুল উড়ছে ঝোড়ো হাওয়ায়; হাত-পা নেড়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো কথা বলছেন তিনি—যেন তাঁর চোখ-কান নিঃসাড় হ'য়ে গেছে, কিছুই শুনছেন না বা দেখতে পাচ্ছেন না। জের্যাদ স্তব্ধ হ'য়ে চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে রইলো।

'মৃত্যু!' ফাঁকা গলায় বলছেন জাকারিয়ুস, জের্যাদ শুনতে পেলো। 'মৃত্যু ছাড়া আর-কিছুই না। নিজের অস্তিত্বটাকেই যখন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছি তখন আর বেঁচে থাকবোই বা কেন? আমি, মাস্টার জাকারিয়ুস, আমিই তো আমার সব ঘড়িগুলোর স্রষ্টা! রুপো, লোহা আর সোনার ওই সব ঘড়ির মধ্যে আমারই প্রাণ তো আমি টুকরো-টুকরো ক'রে বিলিয়ে দিয়েছি—আমার আত্মাকেই দিয়েছি আমি ওদের। একটা ক'রে ওই অভিশপ্ত ঘড়িগুলো থেমে যায় আর মনে হয় বুকের একটা অংশ যেন ছিঁড়ে

গেলো, যেন স্পন্দন থেমে যাবে—কারণ আমারই হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন তো আমি ভ'রে দিয়েছি ওদের মধ্যে!'

অদ্ভুত এই কথাগুলি বলতে-বলতে বৃদ্ধ বারে-বারে তাঁর বেঞ্চির দিকে তাকাচ্ছেন। খোলামেলা ঘড়ির টুকরো-টুকরো কলকব্জা ছড়িয়ে আছে বেঞ্চিতে, সারাবার জন্য তিনিই খুলেছেন এই ঘড়িগুলি। স্প্রিংজড়ানো একটা ফাঁপা নল তিনি তুলে নিলেন, আসলে তাকে বলে চোঙ; তারপর শাঁখের পাকের মতো প্যাঁচানো ইস্পাতের ইস্ক্রুপ খুললেন তিনি; স্থিতিস্থাপকতার নিয়ম অনুযায়ী স্প্রিংটা ছড়িয়ে পড়লো না, বরং কোনো ঘুমন্ত গোখরোর মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে প'ড়ে রইলো স্তব্ধ ও নিঃসাড়; গ্রন্থিল মনে হ'লো এই স্প্রিংকে, মৃত ও শৃঙ্খলিত যেন—যেন কোনো অক্ষম ও অশক্ত বৃদ্ধ, যার রক্ত অনেক দিন আগেই, ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে। রোগা লম্বা আঙুলগুলি দিয়ে জাকারিয়ুস মিথ্যেই স্প্রিংটাকে ছাড়াতে চাইলেন আর দেয়ালে তাঁর এই ব্যর্থ ধ্বস্তাধ্বস্তির ছায়া অতিকায় হ'য়ে পড়তে লাগলো। কিন্তু ব্যর্থ, ব্যর্থ সব চেষ্টা! রোষে আর যন্ত্রণায় হঠাৎ তীব্র চীৎকার ক'রে উঠে তিনি ক্ষুধিত ও টগবগে রোন নদীর বুকে স্প্রিংটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

জেরঁাদের পা দুটি যেন মেঝেয় হঠাৎ আটকে গেছে—নিশ্চল সে দাঁড়িয়ে রইলো রুদ্ধশ্বাসে। বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে চাইলো সে, কিন্তু পারলো না। মাথা ঘুরছে তার, অতিকায় সব দুঃস্বপ্ন যেন হানা দিচ্ছে তার মাথায়। হঠাৎ যেন ছায়ার মধ্যে থেকে কে তার কানে ফিশফিশ ক'রে ব'লে উঠলো, 'জেরঁাদ! তুমি! এখনো জেগে আছো? তোমার ঘরে চ'লে যাও, লক্ষ্মীটি। কন্‌কনে ঠাণ্ডা পড়েছে আজ।'

'ওবের!' জেরঁাদ ফিশফিশ ক'রে উঠলো, 'তুমি!'

'তোমার কষ্ট কি আমাকেও কষ্ট দেয় না?'

হঠাৎ এই মৃদু কথাগুলি যেন জেরঁাদের বুকে রক্ত ফিরিয়ে দিলো। ওবেরের কাঁধে ভর দিয়ে সে বললে, 'বাবার ভয়ংকর কোনো অসুখ করেছে, ওবের। কেবল তুমিই তাঁকে সারাতে পারো, কারণ মেয়ের সান্ত্বনায় তাঁর এই মানসিক বিশৃঙ্খলা মোটেই কমবে না। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই লোকের ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র হ'য়ে পড়েছেন তিনি—তাঁর সঙ্গে কাজ করতে-করতে, নষ্ট ঘড়িগুলি সারাতে-সারাতে, তুমিই শুধু তাঁর চেতনা ফিরিয়ে আনতে পারো। ওবের, নিশ্চয়ই তাঁর কথা সত্যি নয়? নিশ্চয়ই ওই ঘড়িগুলির মধ্যে নিজের প্রাণ তিনি পুরে দেননি?'

ওবের কোনো কথা বললে না।

'বাবার কাজ কি তবে ভগবানের চোখে দোষী?' জের্াদ ভয়ে কেঁপে উঠলো।

'জানি না, জের্াদ।' তার ঠাণ্ডা হাত দুটি নিজের হাতে ঘ'ষে গরম করতে-করতে বললো ওবের, 'জানি না। কিন্তু তুমি তোমার ঘরে ফিরে যাও, লক্ষ্মীটি, একটু ঘুমোলে পরে আশা ফিরে পাবে।'

আস্তে-আস্তে নিজের ঘরে ফিরে এলো জের্াদ, সকাল পর্যন্ত সেখানেই সে ব'সে রইলো একা ও অতন্দ্র, একবারও চোখের পাতা বুজলো না তার। আর মাস্টার জাকারিয়ুস সারাক্ষণ নিশ্চল ও স্তব্ধভাবে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগলেন কেমন ক'রে তাঁর পায়ের তলায় চঞ্চল, ক্ষুব্ধ, রুষ্ট রোন নদী অবিশ্রাম বেগে দিগন্তের দিকে ছুটে যাচ্ছে।

২ বিজ্ঞানের দম্ভ

ব্যবসার বিষয়ে জেনিভার বণিকদের কঠোরতা প্রায় প্রবাদবচনে পরিণত হয়েছে। বিপুল তাদের সম্মানবোধ, অতিরিক্ত তাদের সততা, আর মর্যাদার বিষয়ে তারা অত্যন্ত কঠোর। ফলে বিপুল ধৈর্য্য ও যত্ন সহকারে যে-ঘড়িগুলি বানিয়েছিলেন, সবখান থেকেই সেগুলো যখন ফিরে আসতে লাগলো, তখন লজ্জা ও ধিক্কারে মাস্টার জাকারিয়ুস যে কী পরিমাণ সংকুচিত হয়ে পড়লেন, তা সহজেই আন্দাজ করা যায়।

ঘড়িগুলো যে অকারণেই আচমকা বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অকারণে, কেননা ঘড়ির ভিতরকার চাকা ভালোই আছে, কোথাও ঢিলে বা আলগা হ'য়ে যায়নি, কাঁটাগুলোও ঠিক আছে; কিন্তু স্প্রিংয়ের স্থিতিস্থাপকতা আর একটুও নেই। দুর্জ্ঞেয় এই বিফলতা তাঁর মান ও মর্যাদাকে গভীরভাবে ক্ষুণ্ণ ও আহত করলো। আশ্চর্য-সব আবিষ্কারের জন্য বহুবারই লোকে তাঁকে কালো জাদু বা ডাকিনী তন্ত্রের উপাসক ব'লে সন্দেহ করেছে—এবার সেই সন্দেহ যেন প্রমাণিত হ'য়ে গেলো। আর এইসব গুজব ও জনরব শেষকালে জের্াদেরও কানে পৌঁছোলো; ভয়ে সে প্রায়ই তার বাবার কথা ভেবে শিউরে ওঠে—বিশেষ ক'রে যখন দ্যাখে যে লোকে দারুণ ক্রূরতাভরা চোখে তাঁকে তির্যকভাবে নিরীক্ষণ করছে, তখন তার বুকের রক্ত যেন ঠাণ্ডা হ'য়ে আসে।

তবু এই তীব্র মনস্তাপের রাত্রিটি কেটে গিয়ে যখন সকাল হ'লো, মাস্টার জাকারিয়ুস কিঞ্চিৎ আস্থার সঙ্গে পুনর্বার তাঁর কাজে মন দিলেন। সকাল বেলার সূর্য যেন তাঁকে নতুন সাহস আর প্রেরণা দিলে। ওবের তাড়াতাড়ি গিয়ে কারখানা ঘরে ঢুকলো; জাকারিয়ুস অত্যন্ত শিষ্ট ও অমায়িকভাবে তাকে 'সুপ্রভাত' জানালেন।

'আগের চেয়ে বেশ ভালো বোধ করছি,' বৃদ্ধ বললেন, 'কাল যে কী-একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা হচ্ছিলো মাথার মধ্যে কে জানে। কিন্তু সকালের আলোই যেন রাতের মেঘের সঙ্গে-সঙ্গে তাকেও দূর ক'রে দিয়েছে।'

'সত্যি-বলতে,' ওবের বললে, 'আমাদের দু-জনের কারু পক্ষেই রাতটা ঠিক সহ্য হয় না।'

'তুমি ঠিকই বলেছো, ওবের। কোনোদিন যদি বড়ো হ'য়ে ওঠো তো বুঝতে পারবে যে, দিন যেন তোমার কাছে খাদ্যের মতো জরুরি। যাঁরা জ্ঞানীগুণী ও মস্ত মানুষ, তাঁদের সব সময়েই সহযোগীদের প্রশংসা ও প্রশস্তির জন্য তৈরি থাকতে হয়।'

'মাঝে-মাঝে আমার মনে হয় আপনাকে বুঝি বিজ্ঞানের দম্ভ পেয়ে বসেছে।'

'দম্ভ, ওবের! দম্ভ? অতীত ধ্বংস করে ফ্যালো আমার, কেড়ে নাও আমার বর্তমান, ভবিষ্যৎকে একেবারে টুকরো-টুকরো ক'রে ফ্যালো—আর একমাত্র তবেই আমি লোকচক্ষুর আড়ালে ও অজ্ঞাতসারে বাঁচতে পারবো। বেচারা, আমার এই শিল্প যে কোন মহান অসীমকে স্পর্শ করেছে, তা কি তুমি বুঝতে পারো না? এমনকি তুমিও কি আমারই হাতের নিছক একটা যন্ত্র মাত্র নও?'

'তবু,' ওবের অত্যন্ত বিনীতভাবে তার গুরুদেবকে বললে, 'আপনিই তো আমাকে আপনার ঘড়ির অতি সূক্ষ্ম কলকব্জাগুলি জুড়ে দেবার জন্যে একাধিক-বার প্রশংসা করেছেন। আমি কি তার যোগ্য নই?'

'সে বিষয়ে কোনো প্রশ্ন নেই, ওবের। তুমি একজন ভালো কারিগর, এটা সত্যি, আর এই জন্যই তোমাকে আমি স্নেহ করি। কিন্তু কাজ করার সময় তুমি তো এটাই ভাবো যে তোমার হাতে বুঝি সোনা, রুপো বা তামাই রয়েছে কয়েক টুকরো। তুমি তো এটা কল্পনাও করতে পারো না যে ওই ধাতুগুলো আমার মনীষা ও মেধার কাছ থেকে প্রাণ পেয়ে রক্তমাংসের জীবের মতো স্পন্দিত হ'য়ে ওঠে। ফলে তোমার-তৈরি-করা কোনোকিছু বিকল হ'য়ে গেলে তো আর তুমি ম'রে যাবে না—কিন্তু আমি যাবো।'

কথাগুলি ব'লেই জাকারিয়ুস কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, কিন্তু ওবের কথাবার্তা চালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে।

'সত্যি? সে বললে, 'আপনার কাজ অফুরানভাবে দেখেও আমার আশ মেটে না। পরিষদের উৎসবের জন্য আপনাকে কিন্তু তৈরি থাকতে হবে—কারণ আমি জানি কেলাস-ঘড়ি নিয়ে আপনি যে-গবেষণা করেছেন, তা অমর হ'য়ে থাকবে।'

'সে-বিষয়ে আমারও কোনো সন্দেহ নেই, ওবের,' বৃদ্ধ ঘড়িনির্মাতা ঈষৎ উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন। 'আমি যে কেলাসকে কেটে হিরের মতো স্থায়িত্ব ও আকার দিতে পারি, এটা মোটেই কম সম্মানের বিষয় নয়। আহ্, হিরে-কাটার বিদ্যেকে নিখুঁত ক'রে লুই বেরজেম মহদুপকার ক'রে গেছেন আমাদের—সেই জন্যই তো আমি সবচেয়ে কঠিন পাথরকেও ঘ'ষে মেজে এমন মসৃণ আর চকচকে ক'রে তুলতে পেরেছি, তাঁরই জন্য তাতে ছিদ্র করা সম্ভব হয়েছে আমার পক্ষে।'

কেলাস কেটে তৈরি-করা কতকগুলি সূক্ষ্ম কলকব্জা তুলে দেখালেন জাকারিয়ুস—প্রতিটি কাজই দক্ষতার চরম পরাকাষ্ঠার নজির। ঘড়ির চাকা, কীলক, আধার—সব কিছুই কেলাস কেটে বানিয়েছেন তিনি, আর এই অতি কঠিন কাজেই তাঁর অসীম দক্ষতার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

জাকারিয়ুসের মুখ আরক্তিম হ'য়ে উঠলো! 'এই স্বচ্ছ আধারের ভিতরে ঘড়িটা স্পন্দিত হ'য়ে উঠেছে, তার হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকি শোনা যাচ্ছে—এটা কি আশ্চর্য লাগে না?'

'বছরে এই ঘড়ির যে এক সেকেণ্ডও এদিক-ওদিক হবে না,' তরুণ শিক্ষানবিশটি বললে, 'তা আমি বাজি ধ'রে বলতে পারি।'

'তুমি যে বাজি জিতবে, তাতে, কোনো সন্দেহ নেই। আমার নিজের মধ্যে যা-কিছু শুদ্ধ ও নিষ্পাপ, সব কি আমি এতে ভ'রে দিইনি? আর আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন কি কখনো এদিক-ওদিক হয়? বলো, আমার হৃৎপিণ্ডের ধ্বকধ্বক কি কখনো থেমে যায়?'

গুরুর দিকে মুখ তুলে তাকাবার সাহস পেলো না ওবের।

'সত্যি ক'রে বলো আমাকে,' জাকারিয়ুসের গলা বিষণ্ণ হ'য়ে এলো, 'আমাকে কি তোমার কখনো পাগল ব'লে মনে হয়নি? আমাকে কি কখনো ভয়ংকর নির্বোধ ব'লে মনে হয়নি তোমার? বলো, মনে হয়নি কি? আমার কন্যা আর তোমার চোখে মাঝেমাঝে আমি যেন চিরদণ্ডের ছাপ দেখতে পাই।

ওহ্! আর্ত ও ব্যথাতুর হ'য়ে এলো তাঁর কণ্ঠস্বর, 'জগতে যাদের সবচেয়ে ভালোবাসা যায়, তারা যদি কখনো ভুল বোঝে তো তার চেয়ে কষ্টের আর-কিছু নেই। কিন্তু, ওবের, আমি তোমাকে আজ বলছি যে আমি কোনো ভুল করিনি, এটা একদিন অত্যন্ত সফলভাবে প্রমাণ ক'রে দেবো! না, না, মাথা নেড়ো না, তুমি স্তম্ভিত হ'য়ে যাবে তখন। আমার কথার গভীর অর্থ যেদিন বুঝতে পারবে, সেদিন আমাকেও তুমি সত্যি-সত্যি বুঝতে পারবে। সেদিন দেখবে যে আমি অস্তিত্বের মূল রহস্য বের ক'রে ফেলেছি, সেদিন দেখবে যে প্রাণ কাকে বলে, তা আমি জেনে ফেলেছি, জেনে ফেলেছি কোন জটিল রহস্যের মধ্যে দেহ আর আত্মার অভেদ মিলন রচনা হ'য়ে যায়!'

এ-কথা বলতে-বলতে গর্বে ও অহমিকায় জাকারিয়ুস যেন রাজার মতো উন্নত হ'য়ে উঠলেন। কোনো-এক অতিপ্রাকৃত আগুন জ্বলে উঠলো যেন তাঁর চোখে, তাঁর সর্বাঙ্গ দম্ভে দীপ্ত হ'য়ে উঠলো। আর, সত্যি, যে-দম্ভকে ক্ষমা করা যায়, জাকারিয়ুসের এই দম্ভ বোধহয় তা-ই।

কারণ তাঁর শৈশবে ঘড়িনির্মাণবিদ্যা যেন আঁতুড় ঘরে ছিলো। খ্রীষ্টযুগের চার শতাব্দী আগে প্লাতো বের করেছিলেন রাতের ঘড়ি, এই বিদ্যা তদবধি যেন প্রায় স্থবির হ'য়ে ছিলো। বাঁশির সুরে রাতের প্রহর ঘোষণা করতো, প্লাতোর তৈরি-করা এই ঘড়ি ছিলো অনেকটা 'ক্লেপসিড্রা'র মতো। ওস্তাদ কারিগরেরা তার যান্ত্রিক দিকের চেয়ে শিল্পিতার দিকে বেশি নজর দিতেন, ফলে সে-যুগে যেন কে কত সুন্দর ঘড়ি বানাতে পারে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিলো; লোহায়, তামায়, কাঠে বা রুপোয় কারুকাজ করা হ'তো এইসব ঘড়ি—চেল্লিনির কলসের মতো সুন্দর শিল্পকর্ম যেন। উৎকিরণ বিদ্যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রচিত হয়েছিলো এ-যুগে: সময় যদিও ঠিকমতো দিতো না, তবু তাদের উৎকর্ষতা অমান্য করার মতো নয়। শিল্পীর কল্পনা কলকব্জার চেয়েও বেশি নিবদ্ধ ছিলো বহির্বিভাগে: আধার ও আবরণ কত সুন্দর করা যেতে পারে, দৃষ্টি ছিলো সেই দিকে, সচল পুতুলে আর গানের সুরে ঘড়িগুলি যেন দামি খেলনা হ'য়ে উঠেছিলো। তাছাড়া, সেই সুদূর অতীতে কে-ই বা সময়ের নিখুঁত পরিমাপ নিয়ে মাথা ঘামাতো? ঘড়ি কেন হঠাৎ আস্তে চলতে শুরু করে, তার কারণ তখনও আবিষ্কৃত হয়নি; জ্যোতির্বিদ্যার অঙ্কগণনা তখনও নিক্তিমাপা সংহিতার বশবর্তী হ'য়ে ওঠেনি, পদার্থবিদ্যায় নির্ভুল গণনার ভিত্তি রচিত হয়নি তখনও; নির্দিষ্ট সময়ে দোকান-পশার খোলা বা বন্ধ করার তাগিদ ছিলো না তখন; ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায় তখন ট্রেন ছাড়তো না।

সন্ধ্যেবেলায় ঝমঝম ক'রে ঘণ্টা বেজে উঠতো তখন—আর বিশ্বজোড়া স্তব্ধতার মধ্যে প্রহর ঘোষণা করা হ'তো চীৎকার ক'রে। যদি কাজের পরিমাণের উপর পরমায়ুর পরিমাপ নির্ভর করে, তাহ'লে—বলতে হয়—লোকে তখন এত দীর্ঘজীবী ছিলো না—কিন্তু তারা আরো ভালভাবে বেঁচে থাকতে জানতো। এই বিশ্বসৃষ্টির পরম রহস্য ধ্যান ক'রে হৃদয় তখন সমৃদ্ধ হ'তো। দুশো বছর লাগতো তাদের একটি গির্জে বা মঠ বানাতে ; কোনো শিল্পী সারা জীবনে কেবল গোটা কয়েক ছবি আঁকতেন ; কবি লিখতেন একটি মাত্র মহাকাব্য ঃ কিন্তু তবু উত্তরকাল সেই সরল অতীতের কাছ থেকে কত আশ্চর্য রচনা পেলো।

অবশেষে যখন নির্ভুল বিজ্ঞানের অগ্রগতি শুরু হ'লো, ঘড়ি নির্মাণবিদ্যাও ক্রমশ উন্নতিলাভ করতে লাগলো। কিন্তু তবু সেই দুরতিক্রম্য বাধা থেকে গেলো বিরাট প্রাচীরের মতো ঃ সময়ের অবিরাম ও নিয়মিত পরিমাপ নেয়া তখনও সাধ্যাতিরিক্তই থেকে গেলো।

এই বন্ধ্যা ভূমিতেই জাকারিয়ুস ঘড়ির এমন একটি গতি-নিয়ন্ত্রক আবিষ্কার করেছিলেন, দোলকের অন্তর্লীন বলের উপর নির্ভর করলো ব'লে যা ঘড়িকে এক গাণিতিক অবিচ্যুতি দিয়েছিলো। এই আবিষ্কারই জাকারিয়ুসের সর্বনাশ করলো ঃ তাঁর মাথা ঘুরে গেলো। তাপমান যন্ত্রে যেমন পারদ ফুলে ওঠে, তেমনি তাঁর বুকে স্ফীত হ'য়ে উঠলো অমেয় দম্ভ—একেবারে যেন শেষ সীমায় পৌঁছলো পারদ, এবার যন্ত্র ফেটে বেরিয়ে আসবে। উপমার সাহায্যে নিজেকে তিনি অচিৎ সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে দিয়েছেন ; আর তাই ঘড়ি বানাতে-বানাতে একদিন তাঁর মনে হ'য়ে গেলো তিনি বুঝি দেহ ও আত্মার মিলনের মূল রহস্যটি ভেদ করেছেন।

কাজেই ওবেরকে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে তাঁর কথা শুনতে দেখে অতি সহজেই তিনি তাঁর নিজের ধ্যান-ধারণা খুলে বললেন ঃ

'তুমি জানো প্রাণ কাকে বলে ? যে-সব স্প্রিং-এর জন্য জীব বেঁচে থাকে তাদের রহস্য তুমি কখনো ভেবে দেখেছো ? নিজেকে পরীক্ষা ক'রে দেখছো কোনো দিন ? না ! অথচ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করলে তুমি সহজেই আমার কাজ আর ভগবানের কাজের মাঝখানে গভীর মিল খুঁজে পেতে ; কারণ তাঁর প্রাণীদের দেখেই ঘড়ির চাকা বানাবার কৌশল শিখেছি আমি।'

উৎসুকভাবে ওবের ব'লে উঠলো, ভগবানের নিশ্বাসকেই তো আত্মা বলি

আমরা—হাওয়া যেমন ক'রে ফুলকে কাঁপিয়ে যায় তাঁর নিশ্বাসও তেমনিভাবে আমাদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার ক'রে দেয়—আর তার সঙ্গে কিনা আপনি কতগুলো লোহা আর তামার কলকব্জার তুলনা করছেন? প্রাণের চেয়ে রহস্যময় অথচ নির্ভুল ও প্রেরণাদীপ্ত কোন যন্ত্রবিদ্যা?'

'প্রশ্ন সেটা নয়', অত্যন্ত নরম স্বরে বললেন বটে জাকারিয়ুস, কিন্তু তাঁর কথার মধ্যে খাদের-দিকে-এগিয়ে-যাওয়া অন্ধের প্রবল জেদ ফুটে উঠলো। 'আমাকে বুঝতে হ'লে, আমার আবিষ্কার-করা সেই সময়-নিয়ন্ত্রক দোলকটির উদ্দেশ্য ও অর্থ মনে রাখতে হবে। যে-সব ঘড়ি ঠিকমতো চলে না, তাদের দেখেই এটা আমি বুঝতে পারি যে যে-গতি তাদের মধ্যে বন্দী হ'য়ে আছে তা ঠিক যথেষ্ট নয়—কোনো স্বাধীন বলের দ্বারা তাকে নিয়ন্ত্রণ ও শাসন না-করলে সেই গতি কোনো কাজেই লাগবে না। সমতা রাখার জন্য কোনো চাকা যদি থাকে তাহ'লেই হয়তো এটা সম্ভব হবে—একদিন আমার মনে হ'লো, এবং অবশেষে ওই গতিকে আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারলুম, আমার স্বপ্ন সফল হ'লো। আমার এই চিন্তাটাকে মহান ঠেকে না তোমার? ঐশ্বরিক ব'লে মনে হয় না কি আমার এই চিন্তাকে, যার বলে আমি বুঝেছিলুম যে কোনো রকমে ঘড়ির মধ্যেই যদি সেই হারিয়ে-যাওয়া গতিকে ফিরিয়ে আনা যায় তাহ'লেই সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে যাবে?'

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো ওবের।

ক্রমশ উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন জাকারিয়ুস। 'ওবের, একবার নিজের দিকে তাকিয়ে ছাখো! তুমি কি বুঝতে পারছো না যে আমাদের মধ্যে যুগপৎ দুটি শক্তি কাজ ক'রে যাচ্ছে—দেহের শক্তি, আর আত্মার—গতি আর তার নিয়ন্ত্রণ। আত্মাই প্রাণের মূল—অর্থাৎ আত্মাই হ'লো গতি, আন্দোলনের উৎস, আলোড়নের আকর। কী থেকে তার সৃষ্টি হয়? কোনো ভাব থেকে? না কি কোনো স্প্রিং বা কোনো নির্জড় প্রভাব থেকে? তা জানি না, কিন্তু এটা জানি যে হৃৎপিণ্ড হ'লো সেই জিনিস। কিন্তু দেহ না থাকলে এই আন্দোলন অসমান হ'য়ে পড়তো, হ'য়ে পড়তো অনিয়মিত ও অসম্ভব! কাজের দেহই এই আত্মাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—দেহই হ'লো সমতা রক্ষার সেই চাকা, আত্মা যার নিয়মিত দোলনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। আর এটা যে কত সত্যি, তার প্রমাণই তো এইখানে যে, খাদ্য পানীয় বা নিদ্রা না-হ'লে—অর্থাৎ দেহের ক্রিয়া নিয়মিত সংঘটিত না হ'লে—মানুষ অসুস্থ হ'য়ে পড়ে। দোলনের ফলে যে-গতিটুকু হারিয়ে যায় তা ঠিক যেমনভাবে আবার দেহকে

জুগিয়ে দেয় আত্মা, আমার ঘড়িতে আশ্চর্য এই গতিনিয়ন্ত্রকটি তা-ই করে। আর কিসের মধ্যে তাহ'লে দেহ ও মনের মিলনের রহস্য লুকিয়ে আছে? একটি চাকা ঘুরে চলে ব'লেই অন্য চাকাটি চলতে পারে। এটাই আমার আবিষ্কার, আর আমি তা হাতে-কলমে খাটিয়েছি আমার কাজের মধ্যে। প্রাণের আর-কোনো রহস্যই অজানা নেই আমার—প্রাণ যে আসলে আশ্চর্য নিখুঁত একটি কল, তা আমি জেনে গেছি।'

মতিভ্রম, সন্দেহ নেই ; কিন্তু তবু জাকারিয়ুস যেন সম্ভ্রম জাগান, কেননা এই বিভ্রমই তাঁকে অসীমের চরম রহস্যের মধ্যে নিয়ে এসেছে। কিন্তু তাঁর কন্যা জের্ঁাদ চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে সব কথাই শুনতে পেলো। ছুটে এসে সে বাবার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো—আর তার দেহটি যেন কান্নার তোড়ে ফুলে-ফুলে উঠতে লাগলো।

'তোর আবার কী হ'লো?' কন্যাকে জিগেশ করলেন জাকারিয়ুস।

'এখানে যদি কেবল একটা স্প্রিং থাকতো,' বুকে হাত চেপে সে বললে, 'তাহ'লে তোমাকে কি এত ভালোবাসতে পারতুম, বাবা?'

নিবিষ্টভাবে জের্ঁাদকে নিরীক্ষণ করলেন জাকারিয়ুস, কোনো জবাব দিলেন না। তারপরেই হঠাৎ বুকে হাত চেপে আর্তনাদ ক'রে উঠলেন তিনি, আর মূর্ছিত হ'য়ে তাঁর পুরোনো চেয়ারটিতে প'ড়ে গেলেন।

'কী হ'লো তোমার, বাবা?'

'শিগগির!' ওবের চীৎকার ক'রে ডাকলো, 'স্কলাষ্টিকা!'

স্কলাষ্টিকা কিন্তু তক্ষুনি এলো না। সদর দরজায় কে যেন কড়া নাড়ছিলো তখন—সে গিয়েছিলো দরজা খুলে দেখতে। সে যখন কারখানা-ঘরে এসে ঢুকলো, বৃদ্ধ ঘড়িনির্মাতা ততক্ষণে চেতনা ফিরে পেয়েছেন। তাকে ঢুকতে দেখে সে কোনো কথা বলার আগেই জাকারিয়ুস বললেন, 'নিশ্চয়ই তুমি আরেকটা নষ্ট ঘড়ি নিয়ে এসেছো, স্কলাষ্টিকা, অভিশপ্ত ঘড়িটা নিশ্চয়ই হঠাৎ বন্ধ হ'য়ে গেছে, তাই না?'

'কী আশ্চর্য! আপনি তা জানলেন কী ক'রে?' ওবেরের হাতে স্কলাষ্টিকা একটি বিকল ঘড়ি তুলে দিলে।

'আমার হৃৎপিণ্ড কখনো ভুল করে না,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন জাকারিয়ুস।

অত্যন্ত যত্নসহকারে চাবি ঘুরিয়ে দম দিলো ওবের—কিন্তু তবু সে-ঘড়ি কিছুতেই আর চলবে না।

বেচারি জের াঁদ—যদি-না ওবেরের কথা তার মনে জেগে থাকতো—হয়তো পিতার সঙ্গেই তার প্রাণ হারাতো ; ওবেরই এখন তার বেঁচে-থাকার একমাত্র আকর্ষণ।

বৃদ্ধ ঘড়িনির্মাতা, ধীরে-ধীরে, নির্জীব ও নিস্তেজ হ'য়ে পড়ছেন। যতই তিনি কেবল একটি বিষয়েই মনঃসংযোগ করছেন, ততই তাঁর ক্ষমতা যেন আরো দুর্বল হ'য়ে আসছে। স্মৃতির বিষন্ন অনুষঙ্গ-বশত সবকিছুই কেমন ক'রে যেন তাঁর অদ্ভুত বাতিকটির সঙ্গে জড়িয়ে যায় ; মনে হয় ক্রমেই যেন মানবিক অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলছেন তিনি, আর তার বদলে যেন কোনো পরাবাস্তব শক্তি জেগে উঠছে তাঁর মধ্যে, যেন কোনো অতিপ্রাকৃত জগতে বেঁচে আছেন তিনি এখন। উপরন্তু, কয়েকজন অসূয়াপরায়ণ ও মৎসর প্রতিদ্বন্দ্বীর চেষ্টায় তাঁর পরিশ্রম ও ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে আবার সেই পুরোনো জনরবটা জেগে উঠলো।

তাঁর ঘড়িগুলি হঠাৎ একযোগে বিকল হ'য়ে যাচ্ছে, এই খবর জেনিভার সেরা কারিগরদের মধ্যে প্রকাণ্ড প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলো। ঘড়ির চাকাগুলো হঠাৎ এ-রকমভাবে অসাড় হ'য়ে যাচ্ছে কেন? বৃদ্ধ জাকারিয়ুসের প্রাণের সঙ্গে তাদের যেন গভীর এক সম্বন্ধ আছে। কিন্তু সেই সম্বন্ধটা আসলে কী? এগুলো এমন-সব রহস্য যে এ-সম্বন্ধে চিন্তা করতে গেলেই কেমন একটা গোপন আতঙ্কে সর্বাঙ্গ শিরশির ক'রে ওঠে। শহরের নানা শ্রেণীর লোকের মধ্যে—তা সে তরুণ শিক্ষার্থী বা প্রাচীন ঘড়িনির্মাতাদের ঘড়ি ব্যবহারকারী কোনো মস্ত ভূস্বামী, যেই হোন না কেন—সকলেই এই অদ্ভুত ও অসাধারণ তথ্যটি লক্ষ না-ক'রে পারলো না। মাস্টার জাকারিয়ুসের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে জেগে উঠলো চারদিকে—কিন্তু লোকের এই আশা সফল হ'লো না। ভয়ানক অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন জাকারিয়ুস ; আর সেই জন্যেই রোজ এই যে অবাঞ্ছিত লোকেরা অবিশ্রান্ত এসে শাসায়, তিরস্কার করে, ভয় দেখায়, তার হাত থেকে বাবাকে রক্ষা করতে পারলো জের াঁদ।

এই জৈব অপলাপ ও ক্ষয়ের বিরুদ্ধে চিকিৎসক আর ওষুধপত্র সমানভাবে অক্ষম ও অসহায় হ'য়ে পড়লো। এই ক্ষয়ের কোনো কারণই কেউ বের

করতে পারলো না ; মাঝে-মাঝে মনে হয় এই বৃদ্ধের হৃৎপিণ্ড যেন আর ধুক্‌ধুক্‌ করে না, হঠাৎ তা যেন বন্ধ হ'য়ে যেতে চায় ; আর তারপরেই আবার এক বিষম ও ভয়ংকর বেগে সেই নিশ্চল হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া শুরু হ'য়ে যায়।

শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের রচনা জনসমক্ষে প্রদর্শন করার রীতি ছিলো তখনকার দিনে। কাজের নতুনত্ব বা নৈপুণ্য দেখিয়ে বহু প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করতে চাইতেন ; ড়াকারিয়ুসের এই অবস্থা কেবল তাঁদের মধ্যেই উজ্জীবন্ত সমবেদনা ও সহানুভূতির উদ্রেক করলো—কেননা তাঁর সম্বন্ধে তাঁরাই সবচেয়ে উৎসুক ও আগ্রহী ছিলেন। এবার আর তাঁকে কোনো ভয় নেই ব'লেই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের এত অনুকম্পা। এই বৃদ্ধের সাফল্য ও বিজয়ের কাহিনী তারা কোনোদিনই ভোলেনি। তারা কি জানে না যখন তিনি তাঁর চমৎকার ঘড়িগুলি প্রদর্শনীতে পাঠাতেন তখন সচলমূর্তিবসানো, গানের মতো বেজে-ওঠা, সেই ঘড়িগুলি লোকের মধ্যে কী পরিমাণ সম্ভ্রম, ভালোবাসা ও প্রশংসার উদ্রেক করতো? ফরাশি দেশ, আলেমান ভূখণ্ড, সুইৎজারল্যাণ্ড—সর্বত্রই কী চড়া দামে বিকোতো সেই ঘড়িগুলি, তা কি তারা কোনোদিনও ভুলতে পারবে ?

এদিকে জের্‌াঁদ আর ওবেরের অবিরাম মমতা ও সেবায় ড়াকারিয়ুসের হৃত শক্তি একটু-একটু ক'রে ফিরে আসতে লাগলো। তাঁর এই রোগ ও বিক্ষোভ তাঁকে অনেকটা শান্ত ক'রে তুলেছে ; যে চিন্তা এতকাল তাঁকে সম্পূর্ণ অধিকার ক'রে বসেছিলো ; এখন তা থেকে নিজেকে তিনি সরিয়ে আনতে পারেন। হাঁটার ক্ষমতা যেই ফিরে পেলেন, অমনি তাঁর কন্যা তাঁকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বাড়ি থেকে বের ক'রে নিয়ে এলো—কেননা এখনো বিরক্ত ও অতৃপ্ত ক্রেতাদের আক্রমণে বাড়িটা সব সময় ভ'রে থাকে। ওবের অবশ্য কারখানায় ব'সে গভীর মনোযোগের সঙ্গে সেই বিদ্রোহী ঘড়িগুলোকে বশ মানাবার চেষ্টা করে সারাক্ষণ, নানাভাবে সে কলকজাগুলি জুড়ে ছাখে যদি কোথাও কোনো টিকটিক শব্দ জেগে ওঠে—কিন্তু তার সব চেষ্টাই বিফল হয়, মিথ্যেই সে এত পরিশ্রম করে এদের নিয়ে। ফলে শেষটায় বেচারি সম্পূর্ণ হতাশ ও স্তম্ভিত হয়ে দু-হাতে মুখ ঢেকে ব'সে থাকে, তবে মনে হয় সেও বুঝি ড়াকারিয়ুসের মতো পাগল হ'য়ে যাবে।

শহরের সবচেয়ে সুন্দর অঞ্চলগুলিতে বাবাকে নিয়ে বেড়ায় জের্‌াঁদ। কখনো সে তাঁর হাত ধ'রে-ধ'রে সাঁৎ-আঁতোয়ানের মঠের পাশ দিয়ে নিয়ে যায়, অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায় এখান থেকে—হ্রদের গায়ের যেখানে কোলন

পাহাড় উঠেছে, একেবারে সেই পর্যন্ত। সকালটি যেদিন জ্যোতির্ময় হয়ে দেখা দেয়, ব্যুয়েৎ পাহাড়ের চূড়ো জেগে ওঠে দিগন্তে। আঙুল তুলে-তুলে বাবাকে সব দেখায় জের্‌াদ—তাদের নামগুলো পর্যন্ত জাকারিয়ুস ভুলে গেছেন! তাঁর স্মৃতির ভিতরে যেন একের পর এক পরদা স'রে যায়, নতুন ক'রে সব নামগুলি জেনে নিতে কেমন একটা ছেলেমানুষি আমোদ ও আনন্দ পান তিনি। মেয়ের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে তিনি তাকান দিগন্তের দিকে, আর একই সূর্যের আলো এসে পড়ে দুজনের মাথায়—একটি মাথায় এলোমেলো ওড়ে শুভ্র চুল, আর অন্যটি সোনালি চুলের গুচ্ছে ভরা।

অবশেষে ধীরে-ধীরে সেই বৃদ্ধ ঘড়িনির্মাতা বুঝলেন যে মোটেই একা নন তিনি জগতে। মাঝে-মাঝে তাঁর এই তরুণী ও রূপসী কন্যার দিকে তাকান তিনি, তারপর নিজের ভেঙে-পড়া জীর্ণ দেহটির দিকে তাকিয়ে তিনি ভাবেন, তাঁর মৃত্যুর পর মেয়েটি একেবারে সহায়-সম্বলহীনা হ'য়ে পড়বে। জেনিভার তরুণ ঘড়িনির্মাতাদের মধ্যে অনেকেই জের্‌াদের প্রণয়-প্রার্থনা করেছিলো; কিন্তু জাকারিয়ুসের এই দুর্ভেদ্য গৃহে কেউই প্রবেশাধিকার পায়নি। কাজেই, স্বাভাবিকভাবেই, জাকারিয়ুসের উন্মত্ততায় যখন এই সাময়িক বিরতি নেমে এলো, তখন তিনি ওবের তুনকেই পাত্র নির্বাচন করলেন। একবার যেই এই চিন্তাটার উদয় হ'লো, অমনি হঠাৎ যেন তিনি আবিষ্কার করলেন যে এরা দুজনে যেন একজনের জন্যই আরেকজন জন্মেছে; দুজনেরই মনের গড়ন একরকম, একই আস্থা ও বিশ্বাস দুজনের; তাদের দুজনেরই হৃৎস্পন্দন যেন কোনো-এক অনড় দোলকের বশবর্তী ব'লে মনে হ'লো তাঁর—অন্তত এই কথাই তিনি স্কলাস্টিকাকে একদিন বললেন।

ঘড়ির সঙ্গে যে-তুলনাটি তিনি দিয়েছিলেন, তা পুরোপুরি মাথায় না-ঢুকলেও বুড়ি স্কলাস্টিকা এ-কথা শুনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হ'য়ে পড়লো; সাধু-সন্তদের নামে শপথ ক'রে সে বললে যে, সিকি ঘণ্টার মধ্যেই সমগ্র জেনিভার এ-কথা জেনে-যাওয়া উচিত। তাকে শান্ত করতে গিয়ে বেশ বেগ পেতে হ'লো জাকারিয়ুসকে; কিন্তু অনেক চেষ্টার পর জাকারিয়ুস তার কাছ থেকে এই কথা আদায় করলেন যে, কিছুতেই সে এই কথা প্রচার করবে না—অবশ্য এই প্রতিশ্রুতি সে আদৌ রেখেছিলো ব'লে কেউ জানে না।

কাজেই, জের্‌াদ আর ওবের তার বিন্দুবিসর্গও না-জানলেও আস্ত জেনিভা তাদের আশু বিবাহ সম্বন্ধে নানা কথা বলতে লাগলো। কিন্তু লোকে যখন এই সম্বন্ধে গাল-গল্প করে, তখন নাকি মাঝে-মাঝে অদ্ভুত ধরনের এক খুকখুক

হাসি শোনা যায়, আর কে নাকি এই কথা ব'লে ওঠে, 'জের্ঁাদ কোনোদিনই ওবেরকে বিয়ে করবে না।'

এই কথা শুনে লোকে ফিরে তাকিয়ে ছাখে বেঁটেখাটো এক অচেনা বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে।

বুড়ো, কিন্তু বয়স কত লোকটার? সে-কথা বলার ক্ষমতা কারুরই ছিলো না। সে বুঝি কয়েক শতাব্দী ধ'রে বেঁচে আছে—একথাই শুধু মনে হ'তো লোকের। মস্ত একটি চ্যাপটামতো মাথা বসানো তার কাঁধে, আর কাঁধটি এতই চওড়া যে সারা দেহের দৈর্ঘ্যে প্রায় সমান ব'লে মনে হয়—এবং দৈর্ঘ্য তিন ফিটের বেশি হবে না। কোনো দোলক বা পেনডুলাম বসবার আধার হ'তে পারে তার দেহ—বলাই বাহুল্য, ঘড়ির ডায়াল হবে তার মুখমণ্ডল, আর সমতা-রক্ষক চাকাটি অনায়াসেই তার বুকের মধ্যে দুলতে থাকবে। নাকটা প্রায় সূর্য ঘড়ির ধরনে তৈরি যেন, এমন সংকীর্ণ ও তীক্ষ্ণ; দাঁতগুলো ফাঁক-ফাঁক হ'য়ে আছে, যেন দুই ঠোঁটের মাঝখানে চাকার দাঁত দেখা যাচ্ছে ও তার গলার স্বরের মধ্যে ঘণ্টার ধাতব ধ্বনি লুকিয়ে আছে যেন, আর কান পাতলে শোনা যাবে তার হৃৎপিণ্ডটি যেন ঘড়ির মতো টিকটিক ক'রে বাজছে। ডায়ালের মধ্যে কাঁটা যেমন ক'রে ঘোরে, তেমনিভাবে হাত নাড়ে সে। কী রকম ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে চলে সে, একবারও পিছন ফিরে তাকায় না। কেউ যদি তার পিছু নিতো তো দেখতো পেতো ঘণ্টায় সে ঠিক এক লিগ পথ হাঁটে, আর তার রাস্তা গেছে প্রায় যেন বৃত্তের মতো গোল হ'য়ে।

এই অদ্ভুত জীবটি খুব বেশিদিন ধ'রে শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে না—বা, বলা যায়, খুব বেশি দিন হ'লো এই জীবটি ছাড়া পায়নি; কিন্তু এটা লক্ষ করা গেছে যে প্রত্যেক দিন সূর্য যখন ঠিক মধ্যরেখা পেরিয়ে যায়, সাঁৎ-পিয়েরের গির্জের কাছে গিয়ে সে থেমে পড়ে তারপর ঠিক বেলা বারোটার ঘণ্টা বেজে যাবার পর আবার সে চলতে শুরু করে। ঠিক এ মুহূর্তটি ছাড়া শহরের যাবতীয় আড্ডা ও গাল-গল্পেরই সে অংশ যেন—বিশেষ ক'রে যেখানেই জ়াকারিয়ুস সম্বন্ধে কোনো আলোচনা হচ্ছে, সেখানেই সে আছে; ফলে কিছুদিনের মধ্যেই ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে লোকেরা পরস্পরকে জিগেশ করতে লাগলো, জ়াকারিয়ুসের সঙ্গে কী সম্পর্ক আছে লোকটার। এটাও সবাই লক্ষ করেছিলো যে জ়াকারিয়ুস যখন তাঁর কন্যার সঙ্গে বেড়াতে বেরোন, তখন এই অদ্ভুত লোকটি যেন একদৃষ্টে জ়াকারিয়ুসের দিকে তাকিয়ে থাকে।

জের্ঁাদ হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করল যে এই অপদেবতাটি তার দিকে

তাকিয়ে কদাকারভাবে মুচকি হাসছে। ভয় পেয়ে সে বাবাকে জড়িয়ে ধরলো।

'কী হ'লে তোর? কন্যাকে জিগেশ করলেন মাস্টার জাকারিয়ুস।

'জানি না, বাবা,' ভীতভাবে উত্তর দিলে জের্‌াঁদ।

'কিন্তু কি-রকম শুকনো দেখাচ্ছে তোকে—পাণ্ডুর ও কালিবর্ণ। এবার কি তোর অসুখ বাঁধিয়ে বসার পালা নাকি? বেশ, তাহ'লে বিষণ্ণভাবে একটু হাসলেন জাকারিয়ুস, 'আমিই তোর শুশ্রূষা করবো না-হয়, অত্যন্ত যত্ন ক'রেই সেবা করবো তোর।'

'না, বাবা, তা নয়। কী-রকম যেন ঠাণ্ডা লাগছে আমার—মনে হয়—'

'কী?'

'মনে হয় ওই লোকটাই এর কারণ। জানো বাবা, লোকটা সব সময়েই আমাদের পিছন-পিছন ঘোরে,' অত্যন্ত নিচু গলায় সে উত্তর দিলো।

জাকারিয়ুস পিছন ফিরে বেঁটে লোকটার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন।

'বাঃ, ঠিক চলেছে তো,' তাঁর গলার স্বরে তৃপ্তির ভাবেই ফুটে উঠলো। 'কাঁটায়-কাঁটায় চারটে বাজছে এখন। ভয় পাসনি, জের্‌াঁদ। ও কোনো মানুষ নয়—আসলে মস্ত একটা ঘড়ি।'

স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো জের্‌াঁদ, আতঙ্কে বাবার মুখের দিকে তাকালো সে। এই অদ্ভুত জীবটির মুখে সময় দেখলেন তিনি কী ক'রে?

'হ্যাঁ, ভালো কথা,' জাকারিয়ুস এ-সম্বন্ধে মোটেই মাথা ঘামালেন না, 'ওবেরকে যে কয়েকদিন ধ'রে দেখছি না!'

'না, বাবা, ও আমাদের ছেড়ে যায়নি,' জের্‌াঁদের কণ্ঠস্বরে লজ্জা ও কোমলতা জেগে উঠলো।

'কী করছে তাহ'লে আজকাল?'

'কাজ করছে ব'সে-বসে।'

'আহ্‌!' জাকারিয়ুস চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ও আমার ঘড়িগুলি সারাচ্ছে, তাই না? অন্তত সারাতে চেষ্টা করছে নিশ্চয়ই? কিন্তু ওগুলো ও সারাতে পারবে না কিছুতেই। কারণ ওদের তো আর মেরামত করলে চলবে না, একেবারে পুনর্জীবন দিতে হবে!

মেয়ে কোনো কথা না-ব'লে চুপ ক'রে রইলো।

'আর কতগুলো ঘড়ি ফিরে এসেছে, জানতে হবে', জাকারিয়ুস যোগ করলেন। 'আহ্‌, যেন শয়তান নিজে এসে তাদের মধ্যে মহাবীর বীজ ছড়িয়ে দিয়ে গেছে!'

এই কথা বলে জ়াকারিয়ুস কি-রকম গম্ভীর আর স্তব্ধ হ'য়ে গেলেন। বাড়ি ফেরার পথে আর একটাও কথা বললেন না তিনি—বাড়ি ফিরে এসেই সোজা কারখানা ঘরে চ'লে গেলেন—অসুখ থেকে ওঠবার পর এই প্রথম তিনি সে-ঘরে ঢুকলেন। আর তাঁর মেয়ে অত্যন্ত বিষণ্ণ হ'য়ে নিজের ঘরে চ'লে গেলো।

জ়াকারিয়ুস যেই তাঁর কারখানা-ঘরের চৌকাঠে এসে দাঁড়ালেন, অমনি দেয়ালের একটা ঘড়িতে ঢং-ঢং করে পাঁচটা বেজে উঠলো। ঘড়িগুলো খুবই ঠিকভাবে চলতো এতকাল—সবগুলো ঘড়ি একসঙ্গে বেজে উঠতো, এক তিলও এদিক-ওদিক হ'তো না, আর জ়াকারিয়ুসের মন গর্ব ও উল্লাসে ভ'রে যেতো। কিন্তু সেদিন একসঙ্গে না-বেজে পর-পর বাজলো ঘড়িগুলো, একটার পরে আরেকটা, ফলে প্রায় পনেরো মিনিট ধ'রে এই ঘণ্টাধ্বনি প্রায় যেন বধির ক'রে দিতে চাইলো তাঁকে। বিষম কষ্টে ব্যথায় জ়াকারিয়ুস যেন ছটফট ক'রে উঠলেন ; হাতুড়ির বাড়ির মতো ঘণ্টাধ্বনি পড়ছে তাঁর গায়ে ; একটার পর একটা ঘড়ির কাছে গিয়ে হাত নাড়তে লাগলেন তিনি—কিন্তু নির্দেশ অমান্য ক'রে বাজনাগুলো ইচ্ছেমতো বেজে উঠলে, কোনো সংগীত পরিচালকের যে-রকম অবস্থা হয়, তাঁর দশাও যেন তেমনি হ'লো ; আর যেন এদের উপর তাঁর আর কোনোরকম কর্তৃত্ব নেই।

শেষ ঘণ্টার রেশ মিলিয়ে যাবার আগেই ঘরের দরজা আবার দুম ক'রে খুলে গেলো ; সামনে সেই খর্বকায় বামনটিকে দেখে জ়াকারিয়ুসের আপাদ-মস্তক যেন শিউরে উঠলো। একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে সেই অদ্ভুত লোকটি বললে, 'মাস্টার জ়াকারিয়ুস আপনার সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে পারি ?'

'কে তুমি ? কে ?' জ়াকারিয়ুস হঠাৎ জিগেশ ক'রে বসলেন।

'আপনারই একজন সহযোগী। সূর্যের গতিবিধি শাসন করাই আমার কাজ।

'ওঃ, তুমি সূর্যকে শাসন করো ?' একটুও বিস্মিত না-হয়ে জ়াকারিয়ুস তাকে সাগ্রহে বললেন, তা, এই কাজের জন্যে তোমার তো বিশেষ প্রশংসা করতে পারবো না, বাপু। তোমার সূর্যের চলাফেরার তো কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই—ফলে তার সঙ্গে মানিয়ে চলতে গিয়ে কখনো আমরা ঘড়ির সময় খানিকটা এগিয়ে নিই, আবার কখনো-বা পেছিয়ে দিই।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন, হুজুর ! ভীষণ লোকটি বলে উঠলো, 'আপনার ঘড়ি যেমন নিখুঁত সময়ে দ্বিপ্রহর ঘোষণা করে, আমার সূর্য সবসময় তা করে

না। কিন্তু একদিন লোকে বুঝতে পারবে যে পৃথিবীর আবর্তনের জন্যই এ-রকম হয়, এবং তখন একটি মধ্যক আবিষ্কার করে লোকে এই অনিয়মের মধ্যে সমতা আনবে।'

'ততদিন পর্যন্ত কি আর আমি বেঁচে থাকবো?' জাকারিয়ুসের চোখ কেমন চক্‌চক্‌ করে উঠলো।

'নিশ্চয়ই বেঁচে থাকবেন!' আগন্তুকটি হেসে উঠলো 'কেন? কোনো দিন মরে যাবেন, এ-ভয় আপনার হচ্ছে নাকি আজকাল?

'হায়! সে-কথা আর কী বলবো! হঠাৎ আমি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছি।'

'সে-সম্বন্ধেই আমার কিছু বক্তব্য আছে। শয়তান জানে, আমি সেই জন্যেই এসেছি। এই বলে অদ্ভুত আগন্তুকটি লাফিয়ে গিয়ে বসলো চামড়ার চেয়ারে। তারপর এমনভাবে পা তুলে আড়াআড়ি ভাঁজ করে রইলো যে মনে হলো ঠিক যেন কোনো শিল্পীর আঁকা কোনো মড়ার খুলির তলায় কাটাকুটি ক'রে-রাখা দুটি হাড়। তারপর বিদ্রূপের ভঙ্গিতে সে বললে, 'কিন্তু, মাস্টার জাকারিয়ুস, তার আগে প্রথমটায় দেখে নিই এই জেনিভা নগরে কী ব্যাপার চলছে। লোকে বলাবলি করছে যে আপনার স্বাস্থ্য নাকি ক্রমেই ভেঙে পড়ছে ফলে আপনার শরীরের ঘড়ি সারিয়ে তোলবার জন্য একজন ধন্বন্তরি নাকি জরুরি হয়ে উঠেছে!'

'এইসব ঘড়িগুলির সচলতা আর আমার প্রাণের মধ্যে কোনো গভীর যোগ আছে বলে মনে হয় না কি তোমার?' মাস্টার জাকারিয়ুস চেঁচিয়ে উঠলেন?

'বাঃ রে! আমার তো মনে হয় ঘড়িগুলোর দোষের শেষ নেই—মহা বদমাশ একেকটা। এই হতচ্ছাড়াগুলি যদি শৃঙ্খলা না-মানে, যা-খুশি তাই করে, তাহ'লে এই উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য যোগ্য প্রতিফল পাওয়া উচিত তাদের। মনে হয়, ইদানীং তাদের চরিত্রশোধনের বিশেষ প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে!'

'উচ্ছৃঙ্খলতা কাকে বলো?' তার ঠাট্টায় জাকারিয়ুস একেবারে আরক্তিম হ'য়ে উঠলেন। 'বংশমর্যাদার জন্য তারা গর্ব করতে পারে না কি?'

'তাই ব'লে এতটা দম্ভ ভালো নয়', আগন্তুকের উত্তর মুহূর্তে তৈরি: 'স্বীকার করি, ভুবনবন্দিত একটি নামের সঙ্গে তাদের সংযোগ আছে, তাদের আধারে এক বিরাট প্রতিভার স্বাক্ষর আছে, তাও মানি; তাছাড়া জগতের সব অভিজাত পরিবারে আমন্ত্রিত হবার সুযোগ যে কেবল তাদেরই আছে,

তাও অস্বীকার করার জো নেই। কিন্তু এটা তো ঠিক যে কিছুকাল হ'লো তারা বিকল হ'য়ে পড়ছে একে-একে, আর আপনি সে-সম্বন্ধে কিছুই করতে পারছেন না। জেনিভার সবচেয়ে হাবা কারিগরও এটা আপনার কাছে মুহূর্তে প্রমাণ ক'রে দিতে পারবে।'

'আমি—মাস্টার জাকারিয়ুস—আমার—' রুষ্ট দন্তে জাকারিয়ুস তাঁর কথা শেষ করতে পারলেন না।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি—মাস্টার জাকারিয়ুস—এমনকি আপনিও হাজার চেষ্টা ক'রেও আপনার ঘড়িগুলিকে সারিয়ে তুলতে পারছেন না।'

'বাঃ রে! হঠাৎ আমার অসুখ ক'রে বসেছিলো ব'লেই তো তাদেরও অসুখ করলো,' জাকারিয়ুসের সর্বাঙ্গে ঠাণ্ডা ঘাম ছড়িয়ে পড়লো।

'বাঃ, তাহ'লে তো ভালোই হ'লো: যেহেতু তাদের স্প্রিং-এ একচুলও স্থিতিস্থাপকতা আনতে পারছেন না, সেইজন্যে আপনার সঙ্গে-সঙ্গে তাদেরও মরতে হবে।'

'তাদেরও মরতে হবে! মোটেই না, কারণ তুমি তো নিজেই বললে যে আমি কোনোদিনই মরবো না। আমি—জগতের এক নম্বর ঘড়িনির্মাতা—মাস্টার জাকারিয়ুস—আমিই তো এইসব সূক্ষ্ম কলকব্জা আর নানা চাকার সাহায্যে অত্যন্ত নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে প্রতিটি ঘড়িকে নিয়ন্ত্রিত করেছি। আমি কি বন্দী ক'রে রাখিনি মহাকালকে—আমি কি রাজার মতো তাকে নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারি না? এই ভ্রাম্যমাণ বিশৃঙ্খল মুহূর্তগুলিকে কোনো দিব্য প্রতিভা নিয়ন্ত্রিত করার আগে কি বিশাল অনিশ্চয়তাই মানবজাতির নিয়তি ছিলো না? জীবনের একটি মুহূর্তের সঙ্গে আরেকটি মুহূর্তের কোনো যোগসূত্র ছিলো কি তখন? কিন্তু তুমি—জানি না তুমি কে, মানুষ না শয়তান—তুমি আমার এই বিরাট শিল্পের মহিমাকে একবারও তলিয়ে দেখলে না। জানো, মানুষের যাবতীয় বিজ্ঞান আমি কাজে লাগিয়েছি। না, না! আমি, মাস্টার জাকারিয়ুস—আমি কিছুতেই মরতে পারি না! কারণ সময়কে শাসন করেছি আমি—বাধ্য অনুগত ও বংশবদ ভৃত্য সে আমার—আমার সঙ্গে-সঙ্গে মহাকালেরও অবসান! আবার সেই অসীমে ফিরে যাবে সে; যে অফুরন্ত সীমাহীনতা থেকে আমার প্রতিভা তাকে বাঁচিয়েছিলো, আবার সেই অসীম শূন্যতার তলহীন গহ্বরে সে চিরকালের মতো হারিয়ে যাবে—যদি আমার মৃত্যু হয় কোনোদিন! এই সৌর পরিবার যাঁর অবদান, যাঁর সংহিতা ও বিধান কীটানুকীট থেকে বিপুল নীহারিকামণ্ডলকে বন্দী ক'রে আছে, সেই সৃষ্টিকর্তার মতো আমিও

মৃত্যুহীন ! আমিই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী—তাঁরই সমান, আমি, মাস্টার জাকারিয়ুস, তাঁর শক্তি কেড়ে নিয়েছি ! ঈশ্বর যদি অসীমকে সৃষ্টি ক'রে থাকেন, তাহ'লে আমি সৃষ্টি করেছি সীমা—সৃষ্টি করেছি সময়, অর্থাৎ ঘণ্টা, মিনিট, মুহূর্ত।' দিগভ্রান্ত কিন্নরের মতো দেখালো এই বৃদ্ধ ঘড়িনির্মাতাকে, যেন সৃষ্টিকর্তার সামনে তিনি সবেগে ও সজোরে বিদ্রোহ ঘোষণা করছেন। অচেনা আগন্তুকটি একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলো ; এই পাপ চিন্তা বুঝি সে-ই সংক্রামিত করেছে তাঁর মধ্যে, এমনি মনে হয় তাকে দেখলে।

'ঠিক বলেছেন, কর্তা!' সে উত্তর দিলে। 'স্বয়ং শয়তানও নিজেকে ভগবানের সঙ্গে এমন চুলচেরা তুলনা করতে পারেনি! কিছুতেই আপনার মহিমার অবসান ঘটতে দেয়া চলবে না। আর সেই জন্যই আপনার এই ভৃত্য আপনাকে এই বিদ্রোহী ঘড়িগুলিকে বশ করার উপায় জানিয়ে দিতে এসেছে।'

'কী সেই উপায়, খুলে বলো আমাকে, বলো!' মাস্টার জাকারিয়ুস চেঁচিয়ে উঠলেন।

'আপনার কন্যার সঙ্গে আমার বিয়ে দিলেই তা আপনি জানতে পারবেন!'

'কী? জের্‌াঁদ—আমার জের্‌াঁদের সঙ্গে—'

'হ্যাঁ, তাঁরই সঙ্গে।'

'কিন্তু আমার কন্যা তো আরেকজনকে ভালোবাসে,' এই অদ্ভুত দাবিতে জাকারিয়ুস আদৌ বিস্মিত বা ক্ষুব্ধ হলেন না।

'আপনার কন্যা ওই ঘড়িগুলোর চেয়ে কম সুন্দর নন—কিন্তু তাঁরও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন একদিন থেমে যাবে—'

'কে? আমার কন্যা? না! কিছুতেই না—'

'আপনার ঘড়ির কথাতেই তাহ'লে আবার ফিরে-আসা যাক। বারে-বারে চেষ্টা ক'রে দেখুন, তারা আদৌ সারে কি না! যান, আপনার সহকারীর সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা করুন গিয়ে। সেরা জাতের ইস্পাত কেটে বানান গিয়ে স্প্রিং। ওবের আর আপনার কন্যার চিরসুখ প্রার্থনা করুন —কিন্তু মনে রাখবেন, আপনার ঘড়িগুলি আর কোনোদিনই চলবে না—আর জের্‌াঁদের সঙ্গেও ওবেরের বিয়ে হবে না!'

এই কথা ব'লেই কদাকার বামনটি চ'লে গেলো। কিন্তু যতই সে তাড়াতাড়ি যাক, সে যাবার আগেই জাকারিয়ুস শুনতে পেলেন তার বুকের মধ্যে ঢং ঢং ক'রে ছটা বাজলো।

এদিকে যত দিন যাচ্ছে, মাস্টার জ়াকারিয়ুসও ততই দেহে ও মনে অবসন্ন হ'য়ে পড়তে লাগলেন। তবু অস্বাভাবিকরকম উত্তেজিতভাবে তিনি প্রত্যেকদিন প্রচণ্ড উৎসাহে কাজে হাত দেন—কে যেন তাঁকে বাধ্য করে কাজ করার জন্য, আর ফলে তাঁর কন্যা কিছুতেই তাঁকে এই কাজ থেকে বিরত করতে পারে না।

সেই অদ্ভুত আগন্তুকটি তাঁকে ভুলিয়ে অন্যায়ভাবে একবারে সংকটের মাঝখানে নিয়ে হাজির করেছিলো; কিন্তু সেই জন্যেই তিনি যেন জেদ ক'রে আরো বেশি দাম্ভিক হ'য়ে উঠেছেন, যেন স্থির করেছেন তাঁর অসাধারণ প্রতিভার দ্বারা তিনি সমস্ত অন্যায় অপবাদ কাটিয়ে উঠবেন। জেনিভা নগরীর যে-সব ঘড়ি তাঁর তত্ত্বাবধানে ছিলো, প্রথমে তিনি সেগুলিকে গিয়ে মেরামত করলেন। চাকাগুলি যে ভালো আছে, কীলকগুলি যে শক্ত ও সুদৃঢ় এবং ভারের সমতা যে এক চুলও নষ্ট হয়নি—তন্নতন্ন ক'রে পরীক্ষা ক'রে এ-বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হলেন। প্রত্যেকটি কলকব্জা, এমনকি ঘণ্টাগুলি পর্যন্ত, তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখলেন—ঠিক যেমনভাবে কোনো ডাক্তার রোগীর বুক পরীক্ষা করে। ঘড়িগুলি যে কেন বিকল হ'য়ে পড়ছে তার কারণ কিন্তু তবু কিছুতেই আবিষ্কার করা গেলো না।

তিনি যখন শহরের ঘড়িগুলো মেরামত করতে বেরোতেন, তাঁর মেয়ে আর ওবের তখন প্রায়ই তাঁর সঙ্গে যেতো। তারা যে আগ্রহভরে তার সঙ্গে যেতে চাচ্ছে, এতে যে তিনি খুশি হতেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যদি তিনি জানতেন যে, তাঁর প্রিয়জনের জন্যই তাঁর জীবন দীর্ঘায়িত হচ্ছে, যদি তিনি জীবনের এই সত্যটা আবিষ্কার করতে পারতেন যে, পিতার কিছু অংশ তাঁর সন্তানের মধ্যে চিরকালের মতো থেকে যায়, তাহ'লে হয়তো তাঁর আয়ু যে শেষ হ'য়ে আসছে, এই চিন্তায় তিনি এমনভাবে মগ্ন ও তন্ময় হ'য়ে পড়তেন না।

বাড়ি ফিরে এসে বৃদ্ধ ঘড়িনির্মাতা যেন কেমন-একটা জরাতুরভাবে আবার উঠে-প'ড়ে তাঁর কাজে লাগতেন। তাঁর যে সাফল্যলাভের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই, এটা যদিও তাঁকে অনেকবার বোঝাবার চেষ্টা করা হ'লো, তবু তিনি এ-ব্যাপারটা যে সম্ভব তা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইতেন না। অবিশ্রান্তভাবে

ঘড়িগুলির কলকব্জা খুলে দ্যাখেন তিনি, তারপর এক-এক ক'রে আবার সব জোড়া লাগান, পরাজয় অনিবার্য জেনেও কিছুতেই হাল ছাড়েন না।

সমস্ত গণ্ডগোলের মূল কারণটা খুঁজে বের করার জন্য ওবের কেবল নিজেকেই কষ্ট ও যন্ত্রণা দেয়—কিন্তু কোনো ফল হয় না। 'নিশ্চয়ই কীলক আর চাকার দাঁতগুলি কোনো কারণে ক্ষ'য়ে যায়, তাই—'

'তুমি আমাকে তিলে-তিলে কষ্ট দিয়ে মারতে চাও?' অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হ'য়ে ওঠেন মাস্টার জ়াকারিয়ুস। 'এই ঘড়িগুলো কি ছেলেখেলা মাত্র? ছোটোদের খেলনা? লেদ-এ চাপিয়ে এই তামার পাতগুলি দিয়ে কাজ করতে গিয়ে আঙুলে আঘাত লাগেনি আমার? যাতে তারা আরো শক্তি পায় এই জন্য আমি কি নিজের হাতে আগুনে গালিয়ে গ'ড়ে-পিটে এই তামার টুকরোগুলো তৈরি করিনি? এই স্প্রিংগুলি কি উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা নয়? আমার চেয়ে পাতলা তেল কি আর কেউ ব্যবহার করতে পারতো? তা যে অসম্ভব তা তুমি নিজেই জানো—ফলে তোমাকে এটা বলতেই হবে যে, এগুলিকে নিশ্চয়ই শনিতে কিংবা শয়তানে পেয়েছে।'

সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত একের পর এক রুষ্ট ক্রেতারা এসে বাড়িতে চড়াও হয়—জ়াকারিয়ুসের সঙ্গে দেখা না-ক'রে ফেরে না কেউ—আর সবাই মিলে এমন হৈ-চৈ করে যে, কার কথায় যে কান দেবেন জ়াকারিয়ুস তা ভেবেই পান না।

'কেবলই পিছিয়ে পড়ে আমার ঘড়িটা—হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও কিছুতেই ঠিক সময় দেয় না,' কেউ অভিযোগ করে।

কেউ বা বলে, 'এই ঘড়িটা এত একগুঁয়ে যে, এক চুলও নড়ে না—জোশুয়ার সূর্যের মত নিশ্চল কেবল দাঁড়িয়েই থাকে।'

'আর এ-কথা যদি সত্যি হয় যে,' অনেকেই এ-কথা ব'লে যায়, 'আপনার ঘড়িগুলিতে আপনার স্বাস্থ্যের প্রভাব পড়ে, তাহ'লে দয়া ক'রে যত শিগগির সম্ভব সেরে-ওঠার চেষ্টা করুন।'

জ়াকারিয়ুস শুধু উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন তাদের দিকে, আর কেবলই মাথা নাড়েন, নয়তো বিষণ্ণভাবে ব'লে ওঠেন: 'বসন্তকাল আসুক—অন্তত ততদিন ধৈর্য ধ'রে অপেক্ষা করুন। বসন্তকালে তো জীর্ণ ও জরাগ্রস্ত নতুন ক'রে প্রাণ পেয়ে যায় যেন। সূর্য চাই আমাদের, যাতে ঠাণ্ডা রক্তও গরম হ'য়ে ওঠে।'

'বাঃ, চমৎকার! সারা শীতকাল ধ'রে ঘড়িটা যদি রোগে ভোগে, তাহ'লেই

হয়েছে!' রেগে ব'লে ওঠে কেউ-কেউ। 'আধারের উপরে যে আপনার নামটা স্পষ্ট ক'রে লেখা আছে, তা কি আপনি ভুলে গেছেন, মাস্টার জাকারিয়ুস? ঈশ্বরের দোহাই, নিজের স্বাক্ষরের মর্যাদা রাখার জন্য একটু চেষ্টা করুন।'

শেষকালে এমন হ'য়ে উঠলো, লোকের তিরস্কার আর সহ্য করতে না-পেরে এই বৃদ্ধ ঘড়িনির্মাতা পুরোনো সিন্দুক থেকে স্বর্ণমুদ্রা বের ক'রে এক-এক ক'রে সবগুলি বিকল ঘড়িই আবার কিনে নিতে লাগলেন। এ-কথা শুনে ক্রেতারা দঙ্গল বেঁধে আসতে লাগলো, আর জলের মতো বেরিয়ে যেতে থাকলো তাঁর সব টাকা। কিন্তু তাঁর সততায় একটিও আঁচড় পড়লো না। জেরঁাদ কিন্তু সাগ্রহে তাঁর এই সম্মানবোধের প্রশংসা করলে—অথচ এই জন্যে ক্রমে তাঁর সর্বস্বান্ত হ'য়ে যাবার জোগাড় হ'লো; শেষকালে ওবের নিজের জমানো টাকাও তার গুরুদেবকে নিবেদন করতে চাইলো।

পিতৃস্নেহের এই ভরাডুবির মধ্যেও মাঝে-মাঝে কাঠকুটো আঁকড়ে ধরতে চান জাকারিয়ুস, 'শেষকালে আমার মেয়ের কী হবে?'

সাহস সঞ্চয় ক'রে ওবের কিছুতেই আর এ-কথা বলতে পারে না যে ভবিষ্যতের উপর তার অসীম আস্থা ও প্রত্যাশা আছে; সে যে জেরঁাদকে গভীরভাবে ভালোবাসে, এ-কথাটি সে আর প্রকাশ ক'রে বলতে পারে না। সেদিন যদি সাহস ক'রে কথাটি বলতে পারতো, মাস্টার জাকারিয়ুস হয়তো তক্ষুনি তাকে তাঁর কন্যাজামাতা-রূপে গ্রহণ ক'রে সেই অলুক্ষণে ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ ক'রে দিতেন। 'জেরঁাদের সঙ্গে ওবেরের বিয়ে? উহু, কোনোদিনই হবে না', এই ভয়ংকর কথাটি এখনো তাঁর কানে অবিশ্রাম গুঞ্জন ক'রে ফেরে।

বিকল ঘড়িগুলি কিনে-নিতে নিতে জাকারিয়ুস শেষকালে যেন দেউলে হ'য়ে গেলেন। কারুকাজ-করা দামি-দামি সব পুরোনো বাসন-কোশন সব অচেনা লোকের হাতে তুলে দিলেন তিনি, বাড়ির দেয়ালে কাজ-করা যে-সব সুন্দর প্যানেল ছিলো, সব তিনি বেচে দিলেন। প্রাচীন ফ্লেমিশ শিল্পীদের আশ্চর্য ছবিগুলি আর জেরঁাদের চোখে পড়ে না; সব তিনি বেচে দিলেন—এমনকি তিনি নিজে যে-সব সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছিলেন, তাও এই হুলুস্থুলের মধ্যে ক্রেতাদের তুষ্ট করার জন্য বেচে দিতে হ'লো।

কেবল স্কলাষ্টিকাই এ-সম্বন্ধে কারু কাছে কোনোরকম যুক্তিতর্ক শুনতে চাইতো না। কিন্তু এইসব নাছোড়বান্দা লোকগুলিকেও সে কিছুতেই আটকাতে পারতো না—প্রভুর সঙ্গে দেখা ক'রে শেষ পর্যন্ত তারা কোনো-না-কোনো দুর্মূল্য জিনিশ নিয়ে চ'লে যেতো—কোনোরকমেই সে তাতে বাধা

দিতে পারতো না। ফলে তাঁর একটানা চ্যাচামেচিতে সমস্ত পাড়া তারপর মুখর হ'য়ে উঠতো—পাড়ার লোকের কাছে অবশ্য আগে থেকেই তার মুখের খ্যাতি ছিলো। তার প্রভু ডাকিনীতন্ত্রের উপাসক, আসলে তিনি একজন জাদুকর মাত্র—এই-যে জনরব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিলো দৃঢ় স্বরে সে তার প্রতিবাদ করতো; কিন্তু ভিতরে-ভিতরে শেষটায় তারও মনে হ'লো বোধকরি ব্যাপারটায় কিঞ্চিৎ সত্য আছে—তাই বারে-বারে তার এই শুভ উদ্দেশ্য প্রণোদিত মিথ্যাচারিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতো ঈশ্বরের কাছে।

মাস্টার জাকারিয়ুস যে ইদানীং ধর্মকর্মে অত্যন্ত অবহেলা করেছেন, এটা সকলেই খেয়াল করেছিলো। এককালে তিনি মেয়েকে নিয়ে নিয়মিত গির্জেয় যেতেন—মানুষের কল্পনার মহিমা ও বিপুলতা অনুভব করতেন তিনি প্রার্থনা-সভায়—প্রত্যেক চিন্তাশীল লোকের যেমন হয়, তাঁরও বুদ্ধিবৃত্তির কাছে এই স্তব ও স্তোত্রের সেই গভীর আবেদন ছিলো। অথচ এখন তাঁকে আর কখনও গির্জেয় দেখা যায় না; তা ছাড়া মানুষটাও কিছুটা চাপা স্বভাবের—তাঁর চারপাশে যেন অসীম রহস্য ছড়িয়ে আছে; ফলে তার সঙ্গে এবার তাঁর সেই প্রার্থনাসভায় যোগদানে অবহেলাটি যোগ হ'য়ে লোকের সন্দেহ ও অভিযোগকে আরো দৃঢ় ক'রে তুললো। পিতা যাতে ঈশ্বর এবং জগতের কাছে আবার ফিরে আসেন, এই দুই কারণেই জের্ঁাদ এবার ধর্মের সাহায্য নেবে ব'লে স্থির করলে। তাঁর ম্রিয়মাণ আত্মায় হয়তো সঞ্জীবনীর কাজ করবে ধর্ম—অন্তত জের্ঁাদের তাই মনে হ'লো, কিন্তু আস্থা, দীনতা ও বিনতির সঙ্গে অনতিক্রম্য এক দম্ভের প্রবল দ্বন্দ্ব শুরু হ'লো জাকারিয়ুসের হৃদয়ে; বিজ্ঞানের অহংকারের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষ শুরু হ'লো অন্তিম গুণ দীনতার, কেননা বিজ্ঞান তো কেবলি সব-কিছুকে নিজের সঙ্গে জুড়ে দিতে চায়; প্রথম নিয়মের সূত্রগুলি যে একদিন এক অসীম থেকেই উৎসারিত হয়েছিলো, বিজ্ঞান এটা তাকিয়ে দেখতে চায় না।

জাকারিয়ুসের মনের মধ্যে বিজ্ঞানই যখন সর্বেসর্বা, তখন এই তরুণী তার বাবাকে ফেরাতে চাইলো: নতুন ক'রে তাঁকে দীক্ষিত করতে চাইলো জের্ঁাদ; আর তার প্রভাব এতটাই কার্যকরী হ'লো যে, বৃদ্ধ জাকারিয়ুস পরের রোববারে গির্জেয় গিয়ে প্রার্থনাসভায় যোগ দেবেন ব'লে প্রতিশ্রুতি দিলেন। শুনে মেয়ের মন আনন্দে ও উচ্ছ্বাসে ভ'রে গেলো, যেন এতদিনে সে স্বর্গ খুঁজে পেয়েছে। বুড়ি স্কলাস্টিকা তো তার আনন্দ আর চেপে রাখতে পারলো না; এত দিনে সে সব গুজব ও জনরবের যোগ্য উত্তরটি দিতে পারবে, আর যে-ই

তাঁর প্রভুকে ম্লেচ্ছ ও অধর্মাচারী বলতে আসুক, সে তাকে এই দুর্ধর্ষ যুক্তিটি দেখিয়ে দেবে। পাড়াপড়শিদের সবাইকে এই শুভ সংবাদ দিয়ে এলো সে, শত্রু-মিত্র, চেনা-অচেনা—এই খবর না-শুনিয়ে কাউকেই সে ছাড়লো না।

'তাই নাকি! সত্যি? তোমার কথা তো বিশ্বাসই হ'তে চাচ্ছে না, স্কলাষ্টিকা।' লোকে তাকে বললো, 'মাস্টার জ়াকারিয়ুস তো এতকাল শয়তানের সঙ্গেই শলা-পরামর্শ করতেন!'

'তাহ'লে তোমরা শোনোনি তাঁর ঘড়ির ঘণ্টাগুলো কেমন আশ্চর্যভাবে বেজে ওঠে,' বুড়ি দাসী তাদের ব'লে দিলে, 'ওই ঘণ্টাগুলিই ঢং-ঢং ক'রে বেজে প্রার্থনাসভার সময় ঘোষণা করেছে এতকাল।'

'তা মানি। কিন্তু তিনি কি এমন যন্ত্র আবিষ্কার করেননি যা আপনা থেকেই চলে—ঠিক যেন জ্যান্ত মানুষের মতো কাজ ক'রে যায়?'

'সেই-যে তিনি আশ্চর্য একটা লোহার ঘড়ি বানিয়েছিলেন, টাকা ছিলো না ব'লে জেনিভার লোক যা কিনতে পারেনি, আন্দেরনাৎ-এর এক বাগান বাড়িতে যেটা এখন আছে,' রেগে ফুঁসে উঠলো স্কলাষ্টিকা, 'কোনো শয়তানের কোনো সাধ্য ছিলো কি তেমন ঘড়ি বানায়? ঘণ্টায়-ঘণ্টায় এককেটি নীতি-বাক্য বেরিয়ে আসে ডায়াল থেকে—ওই নীতিগুলি পালন করলে যে-কোনো ধর্মভীরু খ্রীস্টানই সোজা স্বর্গে চলে যাবে। একে কি কখনো শয়তানের কাজ বলা চলে?'

সত্যিই এই ঘড়িটা জ়াকারিয়ুসের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। কুড়ি বছর আগে তিনি বানিয়েছিলেন এটা, আর এটার জন্যই খ্যাতির একেবারে শীর্ষদেশে আরোহণ করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কি না তাঁর সম্বন্ধে ডাকিনীতন্ত্রের কথা ওঠে! তবে জ়াকারিয়ুস গির্জেয় গেলে অন্তত এই হবে যে, লোকের সব পিশুনভরা কথা স্তব্ধ হ'য়ে যাবে।

কন্যাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, মাস্টার জ়াকারিয়ুস কিন্তু তা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন; সকালবেলায় সোজা তিনি তাঁর কারখানায় চ'লে যান। বিকল ঘড়িগুলিকে পুনর্জীবন দেবার ক্ষমতা যে, তাঁর মোটেই নেই, এটা বুঝতে পেরে তিনি ঠিক করেছিলেন যে, কোনো নতুন ঘড়ি বানাতে পারেন কিনা তা পরীক্ষা ক'রে দেখবেন। সমস্ত বিফল চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে তিনি এবার কেলাস-ঘড়িটা শেষ করার জন্য উঠে-প'ড়ে লাগলেন: তাঁর ধারণা ছিলো এই ঘড়িটাই তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হবে। কিন্তু খামকাই তিনি সূক্ষ্ম ও নিখুঁত সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলেন, ঘর্ষণ রোধ করবার জন্য খামকাই

তিনি চুনি আর হিরে বসালেন ঘড়িতে; কারণ ঘড়িটায় যেই তিনি দম দেবার চেষ্টা করলেন, অমনি সেটা তাঁর হাত থেকে প'ড়ে গেলো।

এই ঘটনাটা তিনি সকলের কাছে চেপে গেলেন—এমনকি তাঁর কন্যাকেও বললেন না; কিন্তু তারপর থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়তে লাগলো। যেন ক্রমশ-মন্থর-হ'য়ে-যাচ্ছে এমন-এক দোলক হ'লে গেলেন তিনি, যার মূল শক্তি আর বেগ কিছুতেই ফিরে আসবে না—যেন শেষবারের মতো আন্দোলিত হচ্ছে সে, তারপর আস্তে-আস্তে একদিন থেমে যাবে। কোনো-এক অপ্রতিরোধ্য অভিকর্ষ যেন সোজাসুজি তাঁর উপর কাজ ক'রে যাচ্ছে—অনিবার্যভাবে তাঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কবরের দিকে।

জের াঁদ এত উৎসুকভাবে যে-রোববারের প্রতীক্ষা করছিলো অবশেষে তা এলো। আবহাওয়া অত্যন্ত ভালো—আকাশ স্বচ্ছ ও জ্যোতির্ময়; তাপমাত্রা যেন প্রেরণা জাগায়। জেনিভার লোকেরা রাস্তায় বেরিয়েছে দল বেঁধেঃ বসন্ত যে আবার ফিরে এলো, খুশি হ'য়ে এই কথা বলাবলি করতে-করতে যাচ্ছে তারা। অত্যন্ত কোমলভাবে বাপের হাত ধ'রে গির্জের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লো জের াঁদ; স্তবকবচমালা নিয়ে স্কলাষ্টিকা চললো পিছনে। রাস্তার লোকেরা কৌতূহলের সঙ্গে তাদের দিকে তাকিয়ে দেখলো। দেখলো যে বাচ্চা ছেলেকে যেভাবে ধ'রে-ধ'রে হাঁটতে শেখানো হয়, তেমনি ভাবে হাত ধ'রে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বৃদ্ধ ঘড়িনির্মাতাকে—না, বাচ্চা ছেলে নয়, আসলে যেন কোনো অন্ধকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে জের াঁদ। সাঁৎ-পিয়েরের অনুগতরা যখন দেখলো চৌকাঠ পেরিয়ে তিনি গির্জেয় ঢুকলেন, তাঁকে আসতে দেখেই কোনো এক অজ্ঞাত বিষম ভয়ে ভ'রে গেলো তারা।

সারা গির্জে তখন স্তবগানে মুখর। প্রতিবার যেখানে গিয়ে বসে, জের াঁদ সেখানে গিয়ে ভক্তি ও বিনতিভরে অত্যন্ত সরলভাবে নতজানু হ'য়ে বসলো। মাস্টার জ়াকারিয়ুস কিন্তু তার পাশে সোজা দাঁড়িয়ে রইলেন, অনমনীয় ও ঋজু।

সে-যুগ বিশ্বাসের যুগ। শ্রদ্ধাশীলভাবে অনুষ্ঠানটি ধীরে-ধীরে সেই উন্নত মহিমার স্মরণ করলে—কিন্তু এই বৃদ্ধের মনে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধার লেশমাত্র ছিলো না। যে-তীব্র যন্ত্রণায় মানবজাতি ঈশ্বরের করুণা ভিক্ষা ক'রে কাতরভাবে চেঁচিয়ে ওঠে, তাঁর অন্তর তাতে সায় বা সাড়া কিছুই দিলো না। 'চূড়ান্ত মহিমা' গানটিতে যোগ দিয়ে তিনি সেই ঐশ্বরিক দীপ্তির গৌরব ঘোষণা করলেন না; সুসমাচারের বাণী তাঁকে তাঁর অচিৎ জগৎ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারলো না; এমনকি শেষের সেই সমবেত স্তবগানেও তিনি যোগ

দিলেন না। অহংকারে দৃপ্ত এই বৃদ্ধ কেবল নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলেন—পাথরের মূর্তির মতো যেন তিনি, তেমনি নিঃসাড় ও তেমনি স্তব্ধ। এমনকি যখন রুটি আর মদের সেই দিব্য রূপান্তর স্মরণ ক'রে ঘণ্টা বেজে উঠলো, খ্রীস্টের সেই রক্ত-মাংসের বেদনাতেও তিনি মাথা নোয়ালেন না, শুধু অনিমেষ নেত্রে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলেন পুরোহিত কেমন ক'রে নতজানু ভক্তদের ঐশী আমন্ত্রণ পাঠালেন। বাবার দিকে তাকিয়েই জের্ঁাদের দু-চোখ ঘন অশ্রুবাষ্পে ঝাপশা হ'য়ে গেলো। ঠিক সেই সময়ে সাঁৎ-পিয়েরের গির্জের মস্ত ঘড়িটায় ঘণ্টা বেজে উঠলো; সাড়ে-এগারো বাজে। মাস্টার জ়াকারিয়ুস সেই প্রাচীন ও বাঙ্ময় ঘড়িটার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন তক্ষুনি। তাঁর মনে হ'লো ঘড়িটা যেন অনিমেষ লোচনে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে; এক থেকে বারো—প্রতিটি সংখ্যা এমন ভাবে জ্বলছে, জ্বলজ্বল করছে যেন রাঙা অঙ্গার দিয়ে লেখা; ঘড়ির কাঁটা থেকে যেন বিদ্যুতের ফুলকি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে চারদিকে।

স্তবগান শেষ হ'লো। গির্জের রীতি অনুযায়ী বেলা দ্বিপ্রহরে দেবদূতের জয়গান করা হয়; তাই বেদী ছেড়ে যাবার আগে পুরোহিতেরা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন কখন বেলা বারোটার ঘণ্টা পড়ে। আর কয়েক মুহূর্ত পরেই এই স্তব তাঁরা সেই ঐশী কুমারীর চরণে নিবেদন ক'রে দেবেন।

কিন্তু হঠাৎ একটা কর্কশ আওয়াজে গির্জের সেই বিনত পরিবেশ টুকরো-টুকরো হ'য়ে গেলো। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় তীব্র আর্তনাদ ক'রে উঠলেন মাস্টার জ়াকারিয়ুস।

ঘড়ির কাঁটাটা বারোটার ঘরে গিয়ে হঠাৎ যেন মন্ত্রবলে থেমে গেছে, কোনোদিনই আর এই ঘড়িতে বারোটার ঘণ্টা বাজবে না।

তাড়াতাড়ি বাপের দিকে ছুটে গেলো জের্ঁাদ। ছিন্ন গাছের মতো নিশ্চল প'ড়ে গেছেন তিনি মাটিতে; ধরাধরি ক'রে তাঁকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হ'লো।

'মরণ কামড় এটা!' ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো জের্ঁাদ।

ধরাধরি ক'রে বাড়িতে নিয়ে আসা হ'লো তাঁকে; বিধ্বস্তের মতো তিনি প'ড়ে রইলেন—ব্যথায় একেবারে চুরমার হ'য়ে গেছেন যেন। যেন প্রাণ আস্তে-আস্তে তাঁর দেহ থেকে অন্তর্ধান করছে।

মূর্ছা ভেঙে গেলে দেখলেন জের্ঁাদ আর ওবের তাঁর পাশে ঝুঁকে আছে। জীবনের একেবারে শেষ মুহূর্তে পৌঁছে ভবিষ্যৎকে তিনি এখুনি চোখের সামনে

স্পষ্ট দেখতে পেলেন। জেরাঁদ যেন কোনো একাকিনী, সহায়সম্বলহীনা, বিষাদপ্রতিমায় রূপান্তরিত হ'য়ে গেছে, এটাই তাঁর মনে হ'লো।

'পুত্র,' ওবেরকে তিনি বললেন, 'আমার কন্যাকে আমি তোমার হাতেই তুলে দিলাম।' এই ব'লে তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি—তাঁর মৃত্যুশয্যাতেই তারা দুজনে মিলিত হ'লো।

কিন্তু পরক্ষণেই যেন কোনো পরম রোষে তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব ভ'রে গেলো। উঠে বসতে চাইলেন তিনি, ক্ষিপ্ত ও ক্রুদ্ধ। সেই ভীষণ আগন্তুকটির কথা যেন এক অবিশ্রাম স্রোতের মতো তাঁর বুকে ব'য়ে গেলো।

'না-না, মরতে চাই না আমি!' প্রচণ্ডভাবে চীৎকার ক'রে উঠলেন জাকারিয়ুস। 'কিছুতেই মরতে পারি না আমি! আমি, মাস্টার জাকারিয়ুস—আমার ম'রে-যাওয়াটা ঠিক হবে না। আমার খাতা—আমার হিশেবের খাতা!'

এই ব'লে তিনি লাফিয়ে উঠলেন বিছানা ছেড়ে, হিশেবের খাতাটা বের ক'রে আনলেন তাড়াতাড়ি। এই খাতায় ক্রেতাদের নাম-ঠিকানা আর ঘড়ির বর্ণনা লেখা থাকে। তাড়াতাড়ি তার পাতা উলটে গেলেন ক্ষিপ্র ক্ষিপ্ত হাতে—শেষকালে বইয়ের একটা জায়গায় আঙুল দিয়ে দেখালেন তিনি।

'এই যে!' চেঁচিয়ে উঠলেন জাকারিয়ুস। 'এই যে! পিত্তোনাচ্চিয়োকে যে-লোহার ঘড়িটা বিক্রি করেছিলুম, দ্যাখো, কেবল সেটাই আমার কাছে ফিরে আসেনি। এখনো ঘড়িটা চলছে—ঘড়িটা চাই! এখনো তা নষ্ট হ'য়ে যায়নি—এখনো তা বেঁচে আছে! আঃ, এই আমার প্রাণ—যে ক'রেই হোক এই ঘড়িটাকে খুঁজে বের করতেই হবে আমাকে। ঘড়িটাকে আমি এত যত্ন ক'রে সাবধানে রেখে দেবো যে মৃত্যু আর আমার কাছে ঘেঁষতে পাবে না।'

বলতে-বলতে আবার তিনি চেতনা হারিয়ে ফেললেন।

ওবের আর জেরাঁদ এই বিদ্রোহী বৃদ্ধের শয্যার পাশে নতজানু হ'য়ে ব'সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলো।

৫

ঘণ্টা বাজলো

এক-এক ক'রে কত দিন কেটে গেছে। যেন কোনো অতিপ্রাকৃত উত্তেজনা তাঁকে এসে অধিকার করেছে—তাই রোগশয্যা ছেড়ে কেমন ক'রে যেন

উঠেছেন মাস্টার জাকারিয়ুস, আবার কাজে হাত দিয়েছেন তিনি—যেন কোনো অমানুষিক শক্তি পেয়েছেন তিনি কোনোখান থেকে। যেন তাঁর অহংকারই তাঁকে এখনো বাঁচিয়ে রেখেছে। কিন্তু জের‍াঁদ আর নিজেকে প্রতারিত করলো না—তার পিতার দেহ ও মন চিরকালের মতো কোনো দুঃস্বপ্নের মধ্যে হারিয়ে গেছে, এটা সে অবশেষে মেনে নিলো।

পোষ্য কিংবা নির্ভরশীলদের কথা মোটেই চিন্তা না-ক'রে জাকারিয়ুস তাঁর শেষ কপর্দকটুকু পর্যন্ত এক জায়গায় জড়ো করেছেন। কোনো-এক অস্বাভাবিক বল পেয়েছেন যেন তিনি কোত্থেকে—অফুরন্ত যেন তার উৎস; তাঁর হাঁটা-চলায়, কাজ-কর্মে, কথাবার্তায় তা-ই ফুটে বেরোয়—আর সবসময়ে বিড়বিড় ক'রে অস্ফুটভাবে কী যেন বলেন তিনি—তার সব কথা স্পষ্ট বোঝাও যায় না।

একদিন সকালে জের‍াঁদ তাঁর কারখানা ঘরে গিয়ে ছাখে যে, তিনি সেখানে নেই। সারাদিন সে তাঁর জন্যে অপেক্ষা ক'রে কাটালো—কিন্তু মাস্টার জাকারিয়ুস আর ফিরে এলেন না। সে বিলাপ করলো সারা দিন, কিন্তু তার বাবা আর ফিরলেন না।

সমস্ত জেনিভা তন্নতন্ন ক'রে খুঁজেও ওবের যখন তাঁকে কোথাও পেলো না, তখন এটা অনুমান করা গেলো যে, তিনি শহর ছেড়েই চ'লে গেছেন।

'কিন্তু খুঁজে তাঁকে বের করতেই হবে', ওবের বিষণ্ণ খবরটা পৌঁছে দিতেই জের‍াঁদ কেঁদে উঠলো।

'কোথায় যেতে পারেন তিনি?' নিজেকে শুধোলো ওবের।

হঠাৎ কোত্থেকে যেন এক প্রেরণা এলো তার মনে। মাস্টার জাকারিয়ুসের শেষ কথাগুলি মনে প'ড়ে গেলো তার। যে-একটি পুরোনো লোহার ঘড়ি এখনো ফেরত আসেনি, তাঁর প্রাণ নাকি কেবল তার মধ্যেই রয়েছে এখন! নিশ্চয়ই তিনি সেই ঘড়িটারই সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছেন।

ওবের তার ধারণা খুলে বললো জের‍াঁদকে।

'বাবার হিশেবের খাতাটা দেখলেই তো হয়,' জের‍াঁদ বললো।

তক্ষুনি জাকারিয়ুসের কারখানা ঘরে গিয়ে ঢুকলো তারা। হিশেবের খাতাটা খোলাই পড়েছিলো একটি বেঞ্চির উপর। বিকল হ'য়ে গেছে বলে জাকারিয়ুসের তৈরি সবগুলি ঘড়িই ফিরে এসেছিলো, লাল কালি দিয়ে সেগুলি তিনি কেটে রেখেছেন—কেবল একটি বাদে।

'মঁসিয় পিত্তোনাচ্চিয়োর কাছে ঘণ্টা আর সচল মূর্তি সমেত একটি লোহার

ঘড়ি বিক্রি করা হ'লো ; আন্দেরনাৎ-এ তাঁর বাগানবাড়িতে পাঠানো হয়েছে সেটা।'

এটাই হ'লো সেই 'আদর্শ' ঘড়ি, স্কলাষ্টিকা যার সম্বন্ধে সোৎসাহে বাঙ্ময় হ'য়ে ওঠে।

'নিশ্চয়ই বাবা সেখানে গেছেন,' বললো জের্আঁদ।

'চলো, আমরাও সেখানে যাই,' ওবের উত্তর দিলো, 'হয়তো এখনো তাঁকে বাঁচানো যাবে।'

'প্রাণে বাঁচবেন না বটে,' অস্ফুটস্বরে বললো জের্আঁদ, 'কিন্তু অন্তত তাঁর আত্মা রক্ষা পেতে পারে।'

'কী সর্বনাশ! জের্আঁদ, আন্দেরনাৎ-এর বাগানবাড়িটা কোথায়, তা জানো? দেন্ৎস-দ্যু-মিদির গিরিসংকেট—জেনিভা থেকে যেতে কুড়ি ঘণ্টা লাগে। চলো, আর দেরি নয়, এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে হবে আমাদের।'

লেমান্ হ্রদের পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে যে-পথটা দিগন্তের দিকে চ'লে গেছে, সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় স্কলাষ্টিকাকে সঙ্গে নিয়ে ওবের আর জের্আঁদ সেই পথে রওনা হ'য়ে পড়লো। সে-রাত্রে পাঁচ লিগ পথ পেরিয়ে এলো—বেসঁজ বা এরমাঁস মেঅর-দের বিখ্যাত বাগানবাড়ি—কোথাও তারা থামলো না। অনেক কষ্টে তারা হেঁটেই পেরোলো দ্রঁজ-এর পাহাড়ি নদী—আর যেখানেই গেলো সেখানেই জাকারিয়ুসের খোঁজ নিলো তারা, এবং একটু পরেই এটা বুঝতে পারলো যে ঠিক পথেই তারা যাচ্ছে, কোনো ভুল করেনি।

পরের দিন ভোরবেলায় তোনওঁ পেরিয়ে এভিয়াঁতে এসে পৌঁছোলো তারা—আর মাত্র বারো লিগ দূরে সুইৎজারলাণ্ডের সীমান্ত। কিন্তু বাগদত্তা এই যুবক-যুবতী এই ভুবন-মোহন সম্ভাবনাটার কথা একবার ভেবেও দেখলো না। সোজা তারা সামনের দিকে এগিয়ে গেলো—যেন কোনো অমানুষিক শক্তি তাদের হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চলেছে। ওবেরের হাতে একটি বাঁকা ছড়ি রয়েছে ; কখনো জের্আঁদকে, কখনো-বা স্কলাষ্টিকাকে হাত ধ'রে-ধরে নিয়ে যাচ্ছে সে ; তারা যাতে কোনো রকমে অবসাদে ও শ্রান্তিতে ভেঙে-না পড়ে, যথেষ্ট চেষ্টা করেছে সেবিষয়ে। আর তাদের গভীর বেদনা ও অমল প্রত্যাশার কথা নদীর ধারের এই সুন্দর পথটিতে বারে-বারে মুখর হ'য়ে উঠলো। হ্রদের দুই পাড় যেখানে শ্যালেই-এর উচ্চতায় এসে পড়েছে অবশেষে সেই উঁচু ও সংকীর্ণ মাল-ভূমিতে এসে পৌঁছোলো তারা। তারপর দ্রুত এসে পৌঁছোলো ব্যভের-এ—রোননদী আর জেনিভা হ্রদের সংগম যেটা।

ব্র্যভের ছেড়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গে হ্রদের পাশ থেকে বেঁকে দূরে চ'লে গেলো তাদের পথ। আর এই পাহাড়ি পথে তাদের শ্রান্তি ও অবসাদ ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগলো। একে-একে তারা পেরিয়ে এলো জনবিরল পাহাড়ি গ্রামগুলি —ফিয়োনাৎস্‌, শেস, আর কলম্বে। তাদের হাঁটুর জোড়া খুলে আসতে চাচ্ছে তখন, গ্রানাইট পাথরের মতো শক্ত ও বন্ধুর পাহাড়ি পথে চলায় বেশ ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে গেছে তাদের পা—কিন্তু তবু মাস্টার জাকারিয়ুসের কোনো সন্ধান নেই কোথাও।

তবু খুঁজে তাঁকে বের করতেই হবে। তাই তারা কোনো ক্ষুদ্র পল্লি বা মেঁতা-র প্রমোদবীথিকায় বিশ্রাম নেবার কথা ভাবতে পারলে না। অথচ এই প্রমোদবীথিকাই বিস্তৃত হ'য়ে দূরের দিকে গেছে এখান থেকে, আর একদা স্ভাভয়-এর মার্গারিৎ এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। অবশেষে, অবসাদে তারা যখন অর্ধমৃত, সেই সময়ে নোৎর-দাম-দ্যু-সেক্স-এর মঠে পৌঁছোলো তারা। দেন্‌ৎ-দ্যু-মিদির ঠিক তলাতেই এই বীথিকা, রোননদীর ঠিক ছশো ফিট উপরে!

রাত ক'রে এসেছে তখন; তিন পথিকের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করে দিলেন যাজক। তখন তাদের আর এক পাও যাবার ক্ষমতা নেই, ফলে এখানে বিশ্রাম নিতে তারা বাধ্যই হ'লো একরকম।

যাজকটি কিন্তু মাস্টার জাকারিয়ুসের কোনো খবরই দিতে পারলেন না। কী রকম যেন বিষাদে ভরা এই নিঃসঙ্গ পাহাড়ি পথ—এখানে যদি কোথাও তিনি প'ড়ে গিয়ে ম'রেও যান, কেউ তাঁর কোনো খোঁজই পাবে না। বাইরে গভীর অন্ধকার ক'রে এলো, আর হাওয়া যেন ক্ষুধিতের মতো গর্জন ক'রে ফিরলো পাহাড়ের গায়ে-গায়ে—চূড়া থেকে ধ্বস নেমে পড়লো প্রকাণ্ড চীৎকার ক'রে—যেন এই আঁধার রাতে হঠাৎ ক্ষুব্ধ পাহাড়টি তার সুপ্তি ভেঙে জেগে উঠেছে।

যাজকের চুল্লির সামনে কুঁকড়ে ব'সে ওবের আর জের াঁদ ধীরে ধীরে তাঁকে এই করুণ ও শোকার্ত কাহিনীটি খুলে বললো। তুষার ঝ'রে পড়েছিলো তাদের পোশাকে—এক কোণায় সেগুলি শুকোচ্ছে। আর বাইরে চাঁদের এক রাঙা-ভাঙা টুকরো দেখে ডুকরে কেঁদে উঠছে মঠের কুকুরটি—আর বাইরের ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে সেই বিলাপ যেন অদ্ভুতভাবে মিশে যাচ্ছে।

'দম্ভ,' আস্তে-আস্তে যাজকটি তাঁর অতিথিদের বললেন, 'দম্ভই এক দেবতার ধ্বংস ঘটিয়েছিলো একদা। এই ভয়ংকর দেয়ালের গায়েই মানুষের অদৃষ্ট বারে-বারে আছড়ে প'ড়ে মাথা কোটে। দম্ভ কি আর কোনো যুক্তির কথা

শোনে! অহংকারের চেয়ে সর্বনেশে অধর্ম আর কিছু নেই, কেননা তার স্বভাবই হচ্ছে কোনো কথায় কর্ণপাত না-করা। তোমার বাবার জন্যে প্রার্থনা করা ছাড়া আর-কিছুই করার নেই।'

চারজনে যেই নতজানু হ'য়ে বসেছে, অমনি বাইরে কুকুরটি হঠাৎ দ্বিগুণ জোরে ডুকরে উঠলো: কে যেন মঠের দুয়ারে এসে সজোরে ধাক্কা দিচ্ছে।

'খোলো, দরজা খোলো—শয়তানের নামে বলছি, দরজা খোলো—'

হঠাৎ প্রবল করাঘাতে দরজা খুলে গেলো, আর জীর্ণ বসনপরা বিস্রস্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত কে একজন এসে দাঁড়ালো ঘরের মধ্যে।

'বাবা! তুমি!' জের্‌াঁদ চেঁচিয়ে উঠলো।

সত্যি, মাস্টার জাকারিয়ুসই বটে।

'কোথায় আছি আমি, জানো?' উদ্‌ভ্রান্ত গলায় ব'লে উঠলেন জাকারিয়ুস। 'অসীমের মধ্যে—চিরন্তনতায়। সময় থেমে গেছে—আর কোনোদিনও ঘণ্টা বাজবে না—সমস্ত ঘড়ির কাঁটাগুলি খ'শে পড়লো!'

'বাবা', মেয়ের এই করুণ আর্তনাদই বোধকরি বৃদ্ধকে হঠাৎ জীবিতের জগতে ফিরিয়ে নিয়ে এলো। 'জের্‌াঁদ? তুমি এখানে।' চেঁচিয়ে উঠলেন জাকারিয়ুস, 'আর ওবের? তুমিও। ওঃ, বাগদত্ত ব'লে এই পুরোনো গির্জেয় বিয়ে করতে এসেছো তোমরা।'

'বাবা', তাঁর হাত ধ'রে অনুনয় করলো জের্‌াঁদ, 'ফিরে এসো, আমাদের সঙ্গে জেনিভায় ফিরে এসো তুমি।'

হ্যাঁচকা টানে হাতটা ছিনিয়ে নিলেন জাকারিয়ুস, তারপর ক্ষিপ্র গতিতে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন; বাইরে তখন অজস্র ধারায় বড়ো-বড়ো তুষার ঝ'রে পড়ছে।

'সন্তানদের ত্যাগ ক'রে যাবেন না,' ওবের চীৎকার ক'রে বললো।

'কেন ফিরবো?' যেন মূর্তিমান বিষাদ কোন বিষম দূর থেকে কথা ব'লে উঠলো। 'যেখানে আমার জীবন আর নেই, যেখানে আমার একটা অংশ চিরকালের মতো সমাহিত হ'য়ে গেছে, সেখানে আর কিসের জন্য ফিরে আসবো?'

'কিন্তু আপনার আত্মা? সে তো মরেনি! জানি তার চাকাটা ভালো আছে—তার টিকটিক আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি—'

'আত্মা তো কোনো অচিৎ পদার্থ নয়—সে অবিনশ্বর, সে চিরন্তন,' তীব্র স্বরে ব'লে উঠলেন যাজক।

'হ্যাঁ, ঠিক আমার মহিমার মতো। কিন্তু সে এখন আন্দেরনাৎ-এর প্রমোদবীথিকায় বন্দী হ'য়ে আছে—আমি তাকে দেখতে চাই আবার—মুখোমুখি দেখতে চাই তাকে।'

বুকে ক্রুশ আঁকলেন যাজক; স্কলাষ্টিকা কেমন নির্জীব হ'য়ে পড়লো হঠাৎ; ওবের জের‍াদকে জড়িয়ে ধরলো।

'আন্দেরনাৎ-এর সেই কেল্লায় যে থাকে, সে চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে—সে অভিশপ্ত—তার উদ্ধারের কোনো উপায়ই নেই। সে ক্রুশকে সম্মান করে না—তার মুক্তি হবে কেমন ক'রে?'

'বাবা, যেয়ো না ওখানে, যেয়ো না!'

'আমার আত্মাকে ফিরে চাই আমি। আমার আত্মা তো আমারই—'

'ধরো ওঁকে, আটকাও,' জের‍াদ চীৎকার ক'রে উঠলো।

কিন্তু লাফিয়ে চৌকাঠের বাইরে চ'লে গেলেন বৃদ্ধ। রাতের অন্ধকারে কেবল এক অফুরন্ত আর্তনাদ শোনা গেলো: 'আত্মা, আমার আত্মা, আমার আত্মা ..'

জের‍াদ, ওবের আর স্কলাষ্টিকা—তিন জনেই তাঁর পিছন-পিছন ছুটলো। দুর্গম এখানকার পথ, কুটিল আর জটিল আর কষ্টকর। আর সেই পথ ধ'রেই যাচ্ছেন মাস্টার জাকারিয়ুস, যেন কোনো ক্ষিপ্ত ঝড় ব'য়ে যাচ্ছে, যেন কোনো ভয়ংকর চুম্বক তাঁকে সবেগে টান দিয়েছে। পরম আক্রোশে তুষার ঝরছে তাদের উপর, শাদা টুকরোগুলি ঝড়ে উড়ে যাচ্ছে শুভ্র হিম অঙ্গারের মতো।

ধীবান বাহিনীর ভীষণ সংহারের স্মরণে যে-গির্জেটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, তার পাশ দিয়ে যাবার সময় তাড়াতাড়ি তারা বুকে ক্রুশ এঁকে নিলে। কিন্তু মাস্টার জাকারিয়ুসকে কোথাও দেখা গেলো না।

সেই বন্ধ্যা ভূমিতে অবশেষে অন্ধকারের মধ্যে এফিয়োনাৎস নামে ক্ষুদ্র পল্লিটি জেগে উঠলো। ভীষণ নির্জনতার মধ্যে এই ক্ষুদ্র পল্লিটি দেখে অত্যন্ত কঠোর লোকও কেঁপে উঠতো। বৃদ্ধ কিন্তু ঝড়ের মতো এগিয়ে চললেন দেন্‌ৎ-দু-মিদির গিরিখাতে, যেখানে তার তীক্ষ্ণ চূড়া আকাশকে ভেদ ক'রে উঠে গেছে, তার গভীরে তিনি ছুটে চললেন উন্মত্তের মতো।

শীগগিরই জীর্ণ, কাতর ও মলিন একটি কেল্লার ধ্বংসস্তূপ দেখা গেলো চূড়ায়, নিচে ধারালো পাথরের টুকরোর মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে পথ চ'লে গেছে তার উদ্দেশে।

'ওই যে—ওই যে আমার আত্মা!' ক্ষিপ্তের মতো ছুটতে-ছুটতে আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন জাকারিয়ুস।

আন্দেরনাৎ-এর কেল্লাটির ধ্বংসই কেবল তখন আছে। প্রচণ্ড স্থূলাকার স্তম্ভ উঠে গেছে কেল্লার উপর—নড়বোড়ে সেই স্তম্ভটা হাওয়ায় দুলছে কেবল এখন—যে-কোনো মুহূর্তে সমস্ত চুরমার ক'রে কেল্লার ছাতে ভেঙে প'ড়ে যাবে। গভীরতর কোনো আর্তনাদ যেন কালো পাথরের সেই বিশাল স্তূপে মূর্তি পেয়েছে। কালো-কালো কতগুলি মস্ত হলঘর দাঁড়িয়ে আছে সেই ভগ্নাবশেষের মধ্যে—পাথর কেটে-কেটে খিলেন তৈরি হয়েছিলো একদা, এখন তাতে গর্ত গজিয়েছে অসংখ্য, কুণ্ডলী পাকিয়ে গোখরোরা শুয়ে আছে সেখানে !

জঞ্জালভরা এক পরিখার মুখে কেল্লায় যাবার গুপ্তদ্বার। কে যে এই কেল্লায় থাকে, কেউ তা জানে না। নিশ্চয়ই কোনো আধা-দস্যু আধা-অভিজাত জার্মান ধনপতির প্রমোদবীথিকা ছিলো এটা একদা—পরে কোনো দস্যুদল বা জাল টাকা নির্মাতারা এসে আশ্রয় নিয়েছিলো এখানে—শেষে তাদের এখানেই ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। কিংবদন্তি বলে যে শীতের রাতে স্বয়ং শয়তান এসে তার ভয়ংকর নৃত্যসভা বসায় এই গিরিখাতে—এই ধ্বংসস্তূপের ছায়া যেখানে অতিকায়ভাবে কেঁপে-কেঁপে উঠে সেই ভীষণ নাচে যোগ দেয়।

কিন্তু এই অলুক্ষুণে জনরব জাকারিয়ুসকে একটুও দমাতে পারলো না। গুপ্তদ্বারের কাছে গিয়ে পৌঁছোলেন তিনি—কেউ তাঁকে কোনো বাধা দিলো না বা নিষেধ করলো না। মস্ত একটা স্তব্ধ মলিন উঠোনে এসে পৌঁছোলেন তিনি—কেউ তাঁকে সেটা পেরিয়ে যেতে নিষেধ করলো না। সেই অধোগামী উঠোন পেরিয়ে লম্বা একটা বারান্দায় এসে পড়লেন জাকারিয়ুস : বড়ো-বড়ো থাম আর খিলেনগুলি যেন দিনের আলোকে নির্বাসনে পাঠিয়েছে এখান থেকে। চিরন্তন আঁধারের মধ্যে হাওয়া যেন ভারি হ'য়ে আছে এখানে। জাকারিয়ুসকে কেউ কোনো বাধা দিলো না। তাঁর একটু পিছনেই আসছে জের্যাদ, ওবের আর স্কলাস্টিকা।

যেন কোনো অপ্রতিরোধ্য হাত তাঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, আর তাই বুঝি মাস্টার জাকারিয়ুসের মোটেই পথ ভুল হচ্ছে না ; তিনি যেন নিশ্চিত ক'রে জানেন তাঁর পথ, আর তাই এখন ক্ষিপ্র পায়ে এগিয়ে যেতে পারছেন। পোকায় কাটা, ঘুণধরা একটা পুরোনো দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি ; তাঁর প্রবল করাঘাতে দরজার পাল্লা ভেঙে পড়লো, আর মাথার উপরে পাখা ঝাপটে অদ্ভুত বৃত্ত এঁকে উড়তে লাগলো বাদুড় ও চামচিকে।

ঘরটা মস্ত—বিরাট একটা হলঘর আসলে : অন্য ঘরগুলির চেয়ে

অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। থিলেনগুলিতে স্থাপত্যকর্মের প্রভূত নিদর্শন—কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে সাপ, কিম্ভূত ও বিকট সব প্রেতমূর্তি, আরো নানা অদ্ভুত অপজীব—বিশৃঙ্খল ও ভয়ংকরভাবে তারা ভিড় ক'রে আছে দেয়ালে। লম্বা সরু কতগুলি ঘুলঘুলির মতো জানলা—পাল্লাগুলি ঝোড়ো হাওয়ায় যেন শিউরে-শিউরে উঠছে।

হলঘরটার মাঝখানে পৌঁছে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন মাস্টার জ়াকারিয়ুস।

লোহার আংটা দিয়ে দেয়ালের গায়ে টাঙানো আছে সেই ঘড়িটা, যার উপর তাঁর প্রাণ নির্ভর করছে। অতুলনীয় তাঁর এই কীর্তি : প্রাচীন কোনো রোমক মন্দিরের মতো তার গঠন, পেটা লোহার গায়ে ঠেশ দিয়ে আছে সে, ঠেশ দিয়ে আছে তার ভারি ঘণ্টাস্তম্ভ : আর যখন এখানে ঘণ্টা বেজে ওঠে তখন যেন তার ঢং-ঢং আওয়াজে প্রার্থনাসভার গানের সুর বেজে ওঠে। এই তাঁর পরমায়ু—এই ঘড়িটা। মন্দিরের দুয়ারের উপরে একটা 'গোলাপ' বসানো, আর তারই মাঝখান থেকে বেরিয়েছে ঘড়ির দুটি কাঁটা, আর তারই পাপড়িগুলোর চারপাশে বারো ঘণ্টার বারোটি অঙ্ক বসানো—ঘণ্টা যখন বেজে ওঠে, মন্দিরের দুয়ার যেন খুলে যায় মন্ত্রবলে। দরজা আর গোলাপের মাঝখানে, স্কলাস্তিকা যেমন বলেছিলো সেই অনুযায়ী, অনুশাসন ফুটে ওঠে তাম্রলিপিতে—দিনের বিভিন্ন সময়ে সর্বাবস্থায় আচরণীয় বিভিন্ন অনুশাসন ফুটে ওঠে। একদা সত্যিকার কোনো খ্রীস্টানের মতো কোন-এক ঐশী প্রেরণায় আশ্চর্য এই ঘড়িটি বানিয়েছিলেন মাস্টার জ়াকারিয়ুস, যার প্রতিটি জিনিষ ধর্মপুস্তকের সংহিতা মেনে তৈরি করা হয়েছিলো ; প্রার্থনা, স্তব, বিনোদ, নীতিবাক্য, অনুশাসন—সর্বত্রই এক ধর্মীয় নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার ছাপ : এই ঘড়ির নির্দেশ অনুযায়ী কেউ যদি জীবন যাপন করে, তাহ'লে তার ত্রাণ অবশ্যম্ভাবী।

উল্লাসে মাস্টার জ়াকারিয়ুস যেন নেশাতুর হ'য়ে পড়েছেন। তাড়াতাড়ি তিনি ঘড়িটা দখল করবার জন্য এগিয়ে গেলেন, আর এমনি সময়ে ঠিক যেন তাঁর কানের পাশেই বিকট রোলে কে অট্টহাসি ক'রে উঠলো।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ধোঁয়া-ওঠা এক বাতির আলোয় জ়াকারিয়ুস ছাখেন জেনিভার সেই ভীষণ বামনটি!

'তুমি? তুমি এখানে?' চীৎকার ক'রে উঠলেন জ়াকারিয়ুস।

ভয়ে জের্ঁাদ যেন কুঁকড়ে গেলো। ওবেরের গা ঘেঁষে দাঁড়ালো সে।

'আপনাকে শুভদিন জানাই, মাস্টার জ়াকারিয়ুস,' শয়তানের মতো ভয়ংকর এই লোকটা ব'লে উঠলো।

'কে? কে তুমি?'

'সেনর পিত্তোনাচ্চিয়ো—আপনার সেবার জন্য অধীন সর্বদাই প্রস্তুত! আপনার কন্যাকে আমার হাতে তুলে দিতে এসেছেন? আমি যে বলেছিলুম, জের্‌াঁদের সঙ্গে কিছুতেই ওবেরের বিয়ে হবে না, তা আপনার মনে পড়েছে তাহ'লে!'

পিত্তোনাচ্চিয়োর দিকে সবেগে ছুটে গেলো ওবের—কিন্তু ছায়ার মতো সে স'রে গেলো এক পাশে।

'থামো, ওবের!' জাকারিয়ুস চেঁচিয়ে উঠলেন।

'শুভরাত্রি,' ব'লে পিত্তোনাচ্চিয়ো অদৃশ্য হ'য়ে গেলো।

'বাবা, চলো, এই জঘন্য জায়গাটা থেকে পালিয়ে যাই।' কাতরভাবে অনুনয় করলো জের্‌াঁদ: 'বাবা!'

কিন্তু মাস্টার জাকারিয়ুস আর সে-ঘরে তখন নেই। ভাঙাচোরা বারান্দা দিয়ে তিনি তখন পিত্তোনাচ্চিয়োর ছায়ার পিছনে ছুটেছেন। স্কলাস্টিকা, জের্‌াঁদ আর ওবের সেই ভীষণ হলঘরে স্তম্ভিতের মতো হতবাক্‌ দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর একটা পাথরের আসনে চেতনা হারিয়ে প'ড়ে গেলো জের্‌াঁদ; স্কলাস্টিকা তার পাশে নতজানু হ'য়ে ব'সে প্রার্থনা করতে লাগলো; আর ওবের দাঁড়িয়ে রইলো, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। অনিমেষ লোচনে তাকিয়ে দেখতে লাগলো তার বাগ্‌দত্তাকে। অন্ধকারের মধ্যে মরা আলো ঘুরে বেড়াচ্ছে; মাঝে-মাঝে কেবল বন্য নিশাচরদের আনাগোনায় শিউরে শিউরে উঠছে স্তব্ধতা, আর সেই 'মরণ-ঘড়ি' যখন ঢং-ঢং ক'রে বেজে উঠছে তখন সেই নীরবতা যেন ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো হ'য়ে যাচ্ছে।

দিনের আলো জেগে উঠতেই সেই ভগ্নস্তূপের চারপাশ ঘিরে ঘুরে-ঘুরে যে-অফুরন্ত সিঁড়ি চ'লে গেছে, তাতে পা দেবার সাহস পেলো তারা। দু-ঘণ্টা ধ'রে তারা ঘুরলো এই সিঁড়ি-বেয়ে, কোনো জ্যান্ত প্রাণীর সঙ্গে তাদের দেখা হ'লো না। শুধু দূর থেকে তাদের কাতর ডাকের উত্তরে বিষণ্ণ প্রতিধ্বনি ভেসে এলো। কখনো মনে হয় বুঝি জ্যান্ত কবর হ'লো তাদের, কারণ সিঁড়ি নেমে গেছে মাটির তলায় একশো ফুট; আবার কখনো সিঁড়ি তাদের যেখানে নিয়ে আসে, ক্ষুধিত গিরিচূড়া তার অনেক নিচে হিংস্রভাবে ওৎ পেতে আছে।

শেষকালে তারা হঠাৎ আবার সেই মস্ত হলঘরটায় এসে পৌঁছোলো—এইখানেই ছটফট ক'রে ওই কষ্টের রাতটা কাটিয়েছে তারা। ঘরটা এখন

আর ফাঁকা নেই ঃ মাস্টার জাকারিয়ুস আর পিত্তোনাচ্চিয়ো কথা বলছেন সেখানে—একজন সোজা ও শক্ত দাঁড়িয়ে আছেন মড়ার মতো, আরেকজন শিকারী জন্তুর মতো, গুটি মেরে ব'সে আছে এক মারবেল পাথরের টেবিলে।

জের্‌াঁদকে দেখে তার দিকে এগিয়ে এলেন মাস্টার জাকারিয়ুস, তারপর তার হাত ধ'রে পিত্তোনাচ্চিয়োর দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'জের্‌াঁদ, তোমার স্বামীর দিকে তাকিয়ে ছাখো—এঁর সঙ্গেই তোমার বিয়ে হবে।'

জের্‌াঁদের পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত শিউরে উঠলো।

'ককখনো না,' চেঁচিয়ে উঠলো ওবের, 'কারণ আপনার মেয়ে আমার বাগদত্তা।'

'ককখনো না', জের্‌াঁদ যেন দূরাগত কোনো প্রতিধ্বনি।

হো-হো ক'রে হেসে উঠলো পিত্তোনাচ্চিয়ো।

'তাহ'লে কি তুই চাস আমার মৃত্যু হোক!' ভাঙা গলায় বৃদ্ধ ব'লে উঠলেন, 'ওই ছাখ, ওই যে ঘড়িটা, ওরই মধ্যে আমার প্রাণ বন্দী হ'য়ে আছে। যতগুলো ঘড়ি বানিয়েছিলুম, তার মধ্যে এটাই কেবল এখনও অব্দি বিকল হয়নি। আর এই লোকটা কেবল বলছে যে, "আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে দিলেই ঘড়িটা আপনার হ'য়ে যাবে।" আর কোনো দিনও নাকি ঘড়িটায় দম দেবে না সে, এই সে স্থির করছে। সে-ই এখন ঘড়িটার মালিক, তাই সে ইচ্ছে করলেই ভেঙে ফেলতে পারে এটা—ধ্বংসের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ফেলতে পারে আমাকে। হায়, জের্‌াঁদ, শেষকালে তুইও আমাকে ত্যাগ করলি—তুইও আর ভালোবাসিস না আমাকে।'

'বাবা!' যেন কোন মূর্ছার থেকে জেগে উঠলো জের্‌াঁদ।

'তুই যদি একবার জানতিস কী ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে আমাকে, আমার আয়ুর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আছি কত-ক-ত দূরে।' ভাঙা গলায় আবার শুরু করলেন জাকারিয়ুস। 'হয়তো কেউই আর ঘড়িটার যত্ন নেয় না আজকাল। হয়তো স্প্রিংগুলোয় মরচে ধ'রে যাচ্ছে, ছিঁড়ে যাবে কোনো-দিন—হয়তো চাকাগুলো জং ধ'রে হঠাৎ আটকে যাবে একদিন। কিন্তু, একবার যদি আমি একে হাতে পাই তো আমি তার সেবা করতে পারি দিন-রাত, যত্নে অটুট রাখতে পারি তার কলকব্জা—কারণ কিছুতেই মরা উচিত নয় আমার। আমি জেনিভার মহান ঘড়িনির্মাতা—আমার মৃত্যু তো জগতের সর্বনাশেরই নামান্তর। ছাখ, ছাখ, কেমন ধুঁকে-ধুঁকে এগোচ্ছে কাঁটাগুলো।

দেখছিস, এক্ষুনি পাঁচটার ঘণ্টা পড়বে। ওই শোন, ঘণ্টা বেজে উঠলো। তাকিয়ে ছাখ, কোন অনুশাসন বেরিয়ে আসে ভিতর থেকে।'

ঢং-ঢং ক'রে পাঁচটা বেজে উঠলো, আর তার আওয়াজ যেন এক বিষণ্ণ প্রতিধ্বনি তুললো জের াঁদের হৃদয়ে যার রেশ অনেকক্ষণ থেকে গেলো। তারপরে রক্তের মতো রাঙা অক্ষরে এই অনুশাসন ফুটে উঠলো ঘড়ির মধ্যে ঃ

'বিজ্ঞানতরুর ফল তোমাকে অবশ্যই খেতে হবে।'

স্তম্ভিতের মতো পরস্পরের দিকে তাকালো ওবের আর জের াঁদ। কিন্তু কই, ক্যাথলিক ঘড়িনির্মাতার ধর্মীয় অনুশাসন তো এ নয়! নিশ্চয়ই শয়তানের নিশ্বাস পড়েছে এর উপর। কিন্তু জাকারিয়ুস তার দিকে দৃক্‌পাতও করলেন না।

'শুনছিস, জের াঁদ? আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস তুই? বাঁচতেই হবে আমাকে, আরো বাঁচতে হবে। এই শোন, আমার নিশ্বেসের শব্দ—ছাখ, কেমন ক'রে ধমনীর মধ্যে রক্ত ব'য়ে যাচ্ছে। না, তুই তোর বাবাকে মারতে পারিস না। যাতে আমি মৃত্যুহীন হ'য়ে উঠি, যাতে আমি অবিনশ্বর হই, যাতে ঈশ্বরের ক্ষমতা হাতে পাই, সেই জন্যে এই লোকটাকে বিয়ে করতেই হবে তোকে।'

এই পাপবাক্য শুনে স্কলাস্টিকা সভয়ে তার বুকে ক্রুশ আঁকলো, আর উল্লসিত পিত্তোনাচ্চিয়ো অট্টরোলে হেসে উঠলো।

'আর, একে বিয়ে করলে তুই সুখী হবি, জের াঁদ। দেখেছিস এর দিকে তাকিয়ে? ছাখ, এ আর কেউ নয়—মহাকাল! যদি একে বিয়ে করিস, নির্ভুলভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে তোর জীবন। জের াঁদ, আমি তোর জনক, আমার কাছ থেকেই তুই প্রাণ পেয়েছিস—তোর বাবাকে তুই সেই প্রাণ ফিরিয়ে দে।'

'জের াঁদ,' ফিশফিশ ক'রে ব'লে উঠলো ওবের, 'তুমি আমার বাগ্‌দত্তা।'

চেতনা হরিরে ফেললো জের াঁদ। 'কিন্তু তিনি যে আমার বাবা!'

'পিত্তোনাচ্চিয়ো, জের াঁদ তোমারই!' মাস্টার জাকারিয়ুস বললেন, 'এবার তোমার কথা রাখো, পিত্তোনাচ্চিয়ো।'

'এই যে ঘড়ির চাবি,' ভীষণ লোকটা উত্তর দিলে।

কুণ্ডলী-খোলা সাপের মতো লম্বা চাবিটা যেন ছিনেয়ে নিলেন জাকারিয়ুস, দৌড়ে গেলেন তিনি ঘড়িটার কাছে, অবিশ্বাস্য দ্রুতবেগে ঘড়িটায় তিনি দম দিতে লাগলেন। স্নায়ুপীড়ন ক'রে ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ ক'রে উঠলো স্প্রিং। কেবল দমই দিয়ে যাচ্ছেন জাকারিয়ুস, চাবি ঘোরাচ্ছেন তো ঘোরাচ্ছেনই, মুহূর্তের জন্য থামাচ্ছেন না—মনে হচ্ছে পুরো ব্যাপারটা যেন তাঁর আয়ত্তের বাইরে চ'লে

গেছে। ক্রমশ দ্রুত থেকে দ্রুততরভাবে চাবি ঘোরাতে লাগলেন তিনি, অদ্ভুত মোচড় দিচ্ছেন জোরে-জোরে, আর যন্ত্রণায় ছটফট ক'রে উঠছে সর্বাঙ্গ—শেষকালে অবসন্ন অবশ হ'য়ে প'ড়ে গেলেন তিনি নিচে।

'ব্যাস, এক শতাব্দী যাবে এবার, এত দম দিয়েছি।' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি।

হল থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলো ওবের—তার মনে হচ্ছে যেন সে পাগল হ'য়ে গেছে। উন্মত্তের মতো ঘুরলো সে অনেকক্ষণ, তারপর কোনো রকমে এই জঘন্য কেল্লার গোলক ধাঁধা থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পেলো। খোলা হাওয়ায় এসে সে যেন বাঁচলো এবার। তাড়াতাড়ি সে নোৎরদাম-দ্যু-সেক্স-এর মঠটায় ফিরে গেলো! এমন হতাশ ও মরিয়ার মতো সে অনুনয় করলে যে শেষকালে সেই যাজক তার সঙ্গে আন্দেরনাৎ-এর কেল্লায় যেতে রাজি হলেন।

এই তীব্র মনস্তাপ ও যন্ত্রণায় জের্যাঁদ যদি বিলাপ না-ক'রে থাকে, তাহ'লে তার কারণই হ'লো এই যে তার অশ্রুর উৎস একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিলো।

এক মুহূর্তের জন্যও ওই হল ছেড়ে বেরোননি জাকারিয়ুস। বারে-বারে দৌড়ে গিয়ে কান পেতে সেই পুরোনো ঘড়িটার টিকটিক শব্দ শুনেছেন তিনি। আর এর মধ্যে ঘণ্টা বেজে উঠেছে ঘড়িতে, আর স্কলাষ্টিকার সামনে কোনো অনন্ত বিভীষিকার মতো তার চকচকে ডায়ালে এই সংহিতা ফুটে উঠেছে :

মানুষকে ঈশ্বরের সমান হ'তে হবে।'

এই পাপ অনুশাসন যে জাকারিয়ুসকে কিছুমাত্র বিচলিত করেনি তা-ই নয়, নেশাতুরের মতো চেখে-চেখে সোল্লাসে পড়েছেন তিনি এই অনুশাসন, দম্ভে তাঁর বুক ভ'রে গেছে, আর পিত্তোনাচ্চিয়ো তাঁর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থেকেছে সহাস্যে।

ঠিক মধ্যরাতে বিয়ের দলিলে স্বাক্ষর করা হবে ব'লে ঠিক হয়েছে। জের্যাঁদ তো প্রায় যেন নিশ্চেতন কোনো জীব—তার চোখ কান সব যেন নিঃসাড় হ'য়ে গেছে—কিছুই তার কানে ঢোকে না, কিছুই সে চোখে ছাখে না—সব ক্ষমতা হারিয়ে সে যেন নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত হ'য়ে পড়েছে। আর এই ভারি, দমআটকানো স্তব্ধতা ভেঙে যাচ্ছে হয় জাকারিয়ুসের দম্ভোক্তিতে, নয়তো পিত্তোনাচ্চিয়োর খুকখুক হাস্যে।

এগারোটার ঘণ্টা পড়লো ঢং ঢং। শিউরে উঠে মাস্টার জাকারিয়ুস চেঁচিয়ে পড়লেন অনুশাসনটি :

বিজ্ঞানের ক্রীতদাস হ'য়ে পড়তে হবে মানুষকে: স্বজন, পরিজন, বন্ধু—সকলকে উৎসর্গ করতে হবে তার কাছে।'

'ঠিক? চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'জগতে বিজ্ঞান ছাড়া আর কিছুই সত্য নয়।'

সাপের মতো ফোঁস-ফোঁস ক'রে কাঁটাগুলি এগিয়ে যাচ্ছে, আর দোলকটি আরো তীব্র ও ক্ষিপ্রভাবে দুলে যাচ্ছে এদিক-ওদিক, আর একটানা কেবল শব্দ হচ্ছে টিক-টিক-টিক।

কথা বলার কোনো ক্ষমতাই আর নেই জাকারিয়ুসের। প'ড়ে গেছেন তিনি মেঝেয়, শুষ্ক হ'য়ে গেছে যেন তাঁর সর্বাঙ্গ, একেবারেই যেন আর্দ্রতা-হীন—আর একটা ঘড়ঘড়ে ভাঙা গলায় তাঁর বুক চিরে কেবল এই কথাগুলি বেরিয়ে এলো: 'জীবন···বিজ্ঞান!'

আরো দুটি নতুন দর্শক এসে উপস্থিত হ'লো: ওবের আর সেই গির্জের যাজক। জাকারিয়ুস মেঝেয় প'ড়ে আছেন লম্বালম্বি: তাঁর পাশে ব'সে অবিরাম প্রার্থনা ক'রে চলেছে জেরাদ—সে যেন আর বেঁচে নেই, এমনি বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে তাকে।

ঘণ্টা বাজার আগে যে-শুষ্ক কর্কশ আওয়াজ জেগে ওঠে, হঠাৎ অতিকায়-ভাবে সেই শব্দটা প্রতিধ্বনিত হ'লো চারদিকে।

লাফিয়ে উঠলেন মাস্টার জাকারিয়ুস!

'মধ্যরাত্রি!' চেঁচিয়ে ব'লে উঠলেন তিনি।

তৎক্ষণাৎ যাজকটি সেই পুরোনো ঘড়িটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন—এবং মধ্যরাতের ঘণ্টা আর বাজলো না।

অপার্থিব এক যন্ত্রণায় আর্ত চীৎকার ক'রে উঠলেন জাকারিয়ুস: বুঝি তার প্রতিধ্বনি তৎক্ষণাৎ শোনা গেলো নরকের দিগন্ত থেকে দিগন্তে; আর তিনি তাকিয়ে দেখলেন ঘড়ির ডায়ালে শেষ অনুশাসন ফুটে উঠলো:

ঈশ্বরের সমান হ'য়ে ওঠবার চেষ্টা যে করবে, চিরকালের জন্য তাকে রসাতলে যেতে হবে।

একটা যেন বাজ ফেটে পড়লো, এমনি শব্দ ক'রে ফেটে গেলো সেই পুরোনো ঘড়ি—আর ভিতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো স্প্রিংটা, সহস্রবাঁকা ও পেঁচিয়ে-যাওয়া তারটি অদ্ভুতভাবে এঁকে বেঁকে তালগোল পাকিয়ে গেলো কোনো অতিকায় সাপের কুণ্ডলীর মতো! ধ্বস্ত সেই মানুষটি দৌড়ে গেলেন তার কাছে, ব্যর্থ চেষ্টা করলেন সেটা কুড়িয়ে নেবার, আর বারে-বারে ভাঙা

গলায় ব'লে উঠলেন : 'আত্মা—আমার আত্মা—'

জ্যান্ত হ'য়ে উঠলো যেন সেই তারের কুণ্ডলী : লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠলো মেঝেয়, একবার এপাশে, একবার ওপাশে, আর তিনি কিছুতেই তার নাগাল পেলেন না।

শেষকালে পিত্তোনাচ্চিয়ো সেটা কুড়িয়ে নিলে, তারপর ভীষণ এক পাপ-বাক্য উচ্চরণ ক'রে যেন মাটি ভেদ ক'রে কোনো অতল গহ্বরে ঢুকে পড়লো।

চিৎ হ'য়ে প'ড়ে গেলেন মাস্টার জাকারিয়ুস। তাঁর দেহে আর প্রাণ নেই।

আন্দেরনাৎ-এর গিরিচূড়াতেই সমাহিত করা হয়েছিলো বৃদ্ধ ঘড়িনির্মাতাকে।

তারপর ওবের আর জের্ঁাদ ফিরে এসেছিলো জেনিভায়। ঈশ্বর তাদের দীর্ঘজীবন দিয়েছিলেন : আর যতদিন তারা বেঁচেছিলো এই দিগ্‌ভ্রান্ত বিজ্ঞান-সাধকের আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করাটা তারা এর পরে পরে তাদের নিত্যকর্মে পরিণত করেছিলো।

টুপটাপ

১

টুপ! ওই যে, হাওয়ার জোর বেড়ে এলো।

টাপ! মুষলধারে বৃষ্টি ঝ'রে যাচ্ছে।

আশপাশের পাহাড়ের গাছপালার ঝুঁটি ধ'রে নাড়িয়ে দিচ্ছে ঝড়, যেমন তার গর্জন তেমনি তার তীব্রতা! ফ্রিমার পাহাড়ের ঢালে আছড়াচ্ছে রাগি হাওয়া। আর আস্ত উপকূল জুড়ে প্রচণ্ড সমুদ্র অবিশ্রান্তভাবে দুর্গের মতো উঁচু পাড়কে কামড়ে-কামড়ে যাচ্ছে!

টুপটাপ! টুপটাপ!

বন্দর থেকে বেশ কিছুটা ভিতর দিকে লুকিয়ে আছে ছোট্ট শহর লুকট্রোপ: কয়েকশো মাত্র ঘরবাড়ি শহরটাতে, সবুজ বারান্দাঘেরা একেকটা বাড়ি—খোলা সমুদ্র থেকে যখন হাওয়া আসে, এই সবুজ বারান্দাগুলোই তখন বাড়িগুলোকে বাঁচিয়ে দেয়—কিংবা বাঁচাবার একটা ব্যর্থ চেষ্টাই করে মাত্র। চার-পাঁচটা মাত্র গড়ানে রাস্তা গেছে শহরটার মধ্য দিয়ে, পায়ে-চলা আঁকাবাঁকা সরু ঢালু রাস্তা—আসলে রাস্তার একটা আদল দেয় শুধু। নুড়িপাথরে ভরা; ভিতরে কোথাও ফানগ্রোর নামে আগুনের পাহাড় আছে, তারই ছাইভস্ম-জমানো রাস্তা। দিনের বেলায় এই আগুনের পাহাড় তার পেট থেকে ধুলো আর ছাই উগরে দেয়—গন্ধকেভরা ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতো সে-ছাই ছড়িয়ে পড়ে শহরের সবখানে। রাত্তিরে মিনিটে-মিনিটে পাহাড় আগুন বমি ক'রে দেয়। পাঁচশো কের্ট্‌সে দূরের বাতিঘরের মতো ফানগ্রোরের লকলকে আগুনজিভও উপকূলের ছোটো-ছোটো নৌকোগুলোকে আগে থেকে সাবধান ক'রে দেয় রাতের অন্ধকারে: মেগালোক্রাইড-এর জল তীরের কাছে সবসময়ে চরকি দিয়ে ঘোরে ব'লে সবসময়েই বেশ বিপজ্জনক।

শহরের দূর প্রান্তে এখনও ফ্রিমার যুগের কিছু ধ্বংসস্তূপ র'য়ে' গিয়েছে। তার পরেই শহরতলি, কেমন একটা আরব্য উপনিবেশের মতো দেখতে—গোল ছাদ আর শাদা দেয়ালে ঘেরা কাসবা, সূর্যজ্বলা অলিন্দের উপরে তৈরি। তেকোনা কতগুলো পাথর কেমন অসংলগ্ন এলোমেলোভাবে ছড়ানো-ছিটানো।

পাশার দান পড়েছিলো কোন্ দূর কালে, সময় এখন তাদের চৌকো চোখা ধারগুলো অনবরত ঘ'ষে-ঘ'ষে গোল ক'রে দিয়ে গেছে।

শহরের প্রধান দ্রষ্টব্য হ'লো 'ছয়-চার': অদ্ভুত একটা চৌখুপির মতো বাড়ি, রাস্তার একপাশে তার ছটা দরজা, অন্যপাশে চারটে।

শহর চালায় একটা ঘণ্টাঘর; পাহারা দেয়, বলা চলে। সন্ত পিলফেলেনার ঘণ্টাঘর। চারটে দিকই একমাপের, দেয়ালের খোপের মধ্যে ঘণ্টাগুলো লটকানো। জোরে হাওয়া দিলে ঘণ্টাগুলো হঠাৎ-হঠাৎ একসঙ্গে বেজে ওঠে। অলুক্ষুনে চিহ্ন ওটা: অমনভাবে সবগুলো ঘণ্টারই একসঙ্গে বেজে-ওঠা! ও-রকম বেজে উঠলেই আশপাশের সব্বাই কি-রকম সন্ত্রস্ত হ'য়ে ওঠে।

লুকট্রোপ এইরকমই। দূরে দেখা যায় বাড়িগুলো—ছোট্ট পোড়ো বাড়ি, খোড়ো বাড়ির সার, এখানে-ওখানে ছড়ানো-ছিটোনো—ব্রিটানিতে যেমন আখছার উঁচুনিচু জমিতে বাড়িঘর দেখা যায়। কিন্তু এটা আবার ব্রিটানিও নয়। ফরাশিদেশের কোথাও কি না, জানতে চাচ্ছো? জানিনে। ইয়োরোপে? না, তাও বলতে পারবো না।

অন্তত কোনো মানচিত্রের মধ্যে লুকট্রোপকে খুঁজে বার করার চেষ্টা ক'রে যে কোনো লাভ নেই, তা জানি—একেবারে হালের কোনো মানচিত্রে অব্দি তার কোনো নামগন্ধ নেই।

২

ঠক-ঠক! ছয়-চারের ছোট্ট বারবাড়ির দরজায় ঠক ক'রে ছোট্ট আওয়াজ হ'লো। মেসাগ্নিয়ের স্ট্রিটের বাম মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে ছয়-চার: লুকট্রোপের সবচেয়ে ধনী বাড়ি এটা, আরাম আর স্বাচ্ছন্দ্যেভরা, অবশ্য যদি 'আরাম' কথাটার অর্থ লুকট্রোপের কারু জানা থাকে। অন্তত কয়েক হাজার ক্রেৎজের থাকাটাই যদি ধনাঢ্য হওয়ার পরিচায়ক হ'য়ে থাকে, তবে এটা তা-ই।

ঠকঠকের উত্তরে একটা বুনো গরগরে আওয়াজ শোনা গেলো, একটা রাগি গর্জন! বুঝি-বা কোনো নেকড়েরই ডাক হবে! তারপরেই ছয়-চারের দরজার উপরকার ঘুলঘুলিটার ছোট্ট ঢাকা খুলে গেলো।

এক তরুণী বাইরে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছে; কনকনে হাওয়ায় থেকে-থেকে কেঁপে উঠছে বেচারি; শতছিন্ন তার পরনের ঢোলা কামিজ। ডাক্তার ট্রিফুলগাস বাড়ি আছেন কি না, সে জিগেস করলে।

'আছেন, কি নেই, তা নির্ভর করে…'

'আমার বাবা মরতে বসেছে—তার কাছ থেকেই আসছি আমি।'

'কোন্ চুলোয় ব'সে মরছে, শুনি?'

'ফাল কারনিউর ঢালে, এখান থেকে চার কের্ট্সে দূরে।'

'কী নাম তার, শুনি?

'ফোর্ট কার্টিফ!'

৩

ডাক্তার ট্রিফুলগাস কড়া মানুষ। দয়া-মমতার বালাই নেই, কেবল নগদ মুদ্রার ঐকতান শুনলেই সাড়া দেন। তাও সে-টাকা আগাম তুলে দিতে হবে হাতে। এমনকি তাঁর বুড়ো কুত্তো হুরজোফ-এর বুকেও তাঁর চেয়ে দয়া বেশি—স্প্যানিয়েল আর ডালকুত্তোর এক বিশ্রী মিশেল এই হুরজোফ। তাছাড়া ডাক্তার ট্রিফুলগাসের দর্শনী একেক রকম: টাইফয়েডে এত, থ্রম্বসিসে তত, ধন্বন্তরিকুলে যত রোগের নাম বিখ্যাত তার প্রত্যেকটার জন্যেই তাঁর ভিন্ন-ভিন্ন দর্শনী! ফোর্ট কার্টিফ বেচারা গরিব মানুষ—পরিবারটাও হতভাগা। কাজেই তার জন্যে কেন ডাক্তার ট্রিফুলগাস মিথ্যেমিথ্যি এই বিশ্রী ঝড়বাদলের রাতে নিজেকে বাড়ির বাইরে টেনে আনবেন? তাও কি হয়?

'শুধু-শুধু বিছানা ছাড়ালো এই ঠাণ্ডায়!' আবার শুয়ে পড়তে পড়তে ডাক্তার ট্রিফুলগাস বিড়বিড় করলেন, 'বিছানা ছাড়বার দামই তো দশ ফ্রেংজের!'

কুড়ি মিনিটও যায়নি, আবার ঘুপচি বারবাড়ির দরজায় কার কড়া নাড়ার আওয়াজ পাওয়া গেলো।

গালাগাল দিতে-দিতে ডাক্তার বিছানা ছেড়ে উঠে জানলা খুলে ঝুঁকে দাঁড়ালেন।

'কে? কে ওখানে?' চেঁচিয়ে জিগেশ করলেন ডাক্তার।

'ফোর্ট কার্টিফের বউ আমি।'

'ফাল কারনিউর সেই অকম্মাটা?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি না-এলে সে ম'রে যাবে—'

'বেশ তো। তুমি তবে বিধবা হবে।'

'এই নিন কুড়ি ফ্রেংজের!'

'কুড়ি ফ্রেংজের! কাল কারনিউতে যাবার জন্যে মাত্র কুড়ি ফ্রেংজের! চার কের্ট্‌সে দূরে...'

'ভগবানের দোহাই!'

'গোল্লায় যাও, গোল্লায়!'

দুম্‌ করে জানলার পাল্লা বন্ধ হ'য়ে গেলো। কুড়ি ফ্রেংজের! বাঃ, চমৎকার! কুড়ি ফ্রেংজেরের জন্য ঠাণ্ডা লাগিয়ে অসুখ বাধিয়ে বসেন আর কি! সর্দি হোক, নয়তো গা-হাত-পায় ব্যথা! বিশেষ ক'রে কাল আবার কিলট্রেনোতে গিয়ে ধনকুবের বেতো রোগী এডজিনগোফকে দেখার কথা আছে—একবার গেলেই পঞ্চাশ ফ্রেংজের দক্ষিণা!

ওই পঞ্চাশ ফ্রেংজেরের কথা ভাবতে-ভাবতেই ডাক্তার ট্রিফ্‌লগাস আবার বিছানায় এসে শুয়ে পড়লেন।

৪

টুপটাপ! টুপটাপ!...আর তার পরেই ঠক! ঠক! ঠক!

এবার আরো কড়া হাতেই কেউ কড়া নাড়ছে বাইরে। ডাক্তার ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, জেগে উঠলেন। জাগলেন বটে, কিন্তু মেজাজ সে কী তেরিয়া! জানলা খুলতেই বন্দুকের গুলির মতো ঝড় ঢুকলো ঘরের ভেতরে।

'ওই অকম্মাটার কাছ থেকেই আসছি!'

'আবার?'

'আমি ওর মা!'

'মা, বউ, মেয়ে—তিনজনকে নিয়েই সে গোল্লায় যাক, আমি বাধা দেবো না।'

'একটা স্ট্রোক হয়েছে ওর—থ্রম্বসিস—'

'তাতেই তাকে অক্কা পেতে দাও!'

'টাকা এনেছি সঙ্গে', বুড়ি বললে, 'আপনি যদি না-আসেন, তাহ'লে আমার নাৎনি তার বাপ হারাবে, আমার মেয়ে হারাবে তার স্বামী আর আমি...আমি হারাবো আমার ছেলেকে!'

বুড়ির গলা শুনলে একদিক থেকে যেমন দয়া হয়, তেমনি কেমন আবার গা ছমছম করে! কনকনে ঠাণ্ডায় তার শিরার রক্ত নিশ্চয়ই জ'মে গিয়েছে। বৃষ্টি নিশ্চয়ই চামড়া ফুঁড়ে ভিতরে ঢুকে হাড়গোড়শুদ্ধ ভিজিয়ে দিয়েছে এতক্ষণে!

'স্ট্রোক হয়েছে ?—তুশো ফ্রেংজের লাগবে !' হৃদয়হীন ডাক্তার ট্রিফুলগাস জানলা থেকেই জানালেন।

'আমাদের যে মাত্র একশো কুড়ি ফ্রেংজের আছে !'

'তাহলে হবে না। শুভরাত্রি !' দুমদাম আওয়াজ ক'রে আবার জানলাটা বন্ধ হ'য়ে গেলো।

কিন্তু পরে ভেবে দেখলেন—মন্দ ছিলো না। হাঁটতে হবে দেড় ঘণ্টা, আর রোগী দেখতে আধ ঘণ্টা—একুনে দু ঘণ্টা, অর্থাৎ মিনিটে এক ফ্রেংজের ক'রে দেবে বলেছিলো। তেমন বেশি নয় বটে, তবে নেহাৎ ফ্যালনাও নয়।

এবার আর বিছানায় গিয়ে না-গড়িয়ে ডাক্তার বাইরে বেরুবার পোশাক প'রে নিলেন, পায়ে চাপালেন হাঁটু-ঢাকা পেল্লায় জুতো, নিজেকে ঢেকে নিলেন লম্বা ওভারকোটে, মাথায় চাপালেন, টুপি, হাতে পরলেন দস্তানা। তারপর বাতি জাললেন টেবিলে, আর 'মেটেরিয়া মেডিকা'র ১৯৭ পাতাটা খুললেন, তারপর একটু পরেই ছয়-চারের বারবাড়ি পেরিয়ে চৌকাঠে এসে দাঁড়ালেন।

বুড়ি তার হাতের লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েই আছে ঠাণ্ডায় আর বৃষ্টিতে। আশি বছরের দারিদ্রের ভারে সে একেবারে নুয়ে পড়েছে।

'কই, দেখি সেই একশো কুড়ি ফ্রেংজের !'

'এই-যে।...ভগবান আপনাকে একশো গুণ বেশি দেবেন এর !'

'ভগবান ! কেউ তাঁর টাকার রঙ দেখেছে কখনো ?'

শিস দিয়ে হুরজোফকে ডাকলেন ট্রিফুলগাস, তারপর লণ্ঠনটা তার মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে সমুদ্রের ধারের রাস্তা ধরলেন।

বুড়ি গেলো তাঁর পিছন-পিছন।

■

৫

উঃ, কী বিশ্রী আবহাওয়া ! টুপটাপ টুপটাপ ক'রেই চলেছে। পিলফেলেনার ঘণ্টাগুলো ঢং ঢং বেজে উঠেছে ঐ বিষম ঝোড়ো হাওয়ায়। অলুক্ষুনে কাণ্ড ! অলুক্ষুনে, না হাতি ! ডাক্তার ট্রিফুলগাস ও-সব কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন না। কিছুতেই তাঁর কোনো বিশ্বাস নেই, এমনকি চিকিৎসাশাস্ত্রে পর্যন্ত না—একটা জিনিশেই তাঁর কেবল আস্থা আছে, তা হ'লো ধন্বন্তরি বিদ্যার সাহায্যে লোককে কতটা দোহন ক'রে নেয়া যায়।

যেমন আবহাওয়া, তেমনি রাস্তা। নুড়িপাথর, আগুনের পাহাড়ের ছাইভস্ম···সমুদ্দুরের শ্যাওলায় রাস্তা পেছল হ'য়ে আছে, কাঠকুঠোর মতো পায়ের নিচে শব্দ ক'রে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে পাহাড় উগরোনো ছাইভস্ম। কোথাও কোনো আলো নেই, কেবল হুরজোফ যে-লণ্ঠনটা মুখে ক'রে নিয়ে যাচ্ছে তার ঝাপশা কাঁপা আলো রাস্তায় দুলে-দুলে উঠছে। মাঝে-মাঝে অবশ্য আগুনের পাহাড় উগরে দিচ্ছে একেকটা শিখা, আর সেই রাঙা আলোর মধ্যে ধূসর অস্পষ্ট সব ছায়ারা যেন দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে একেবারে···এই অতল জ্বালামুখটার মধ্যে যে কী আছে, কেউ জানে না—হয়তো সেখানে থাকে পাতালের জীবরা, পৃথিবীতে পা দেবামাত্র যারা ছায়া হ'য়ে মিলিয়ে যায়।

তীরের ঢাল ধ'রে বুড়ির সঙ্গে-সঙ্গে এগিয়ে চললেন ডাক্তার। কী-রকম অদ্ভুত ভেজা-ভেজা ভাব সমুদ্রের, কেমন যেন বিষণ্ণ ফেনিল এক ধবলিমা; ভাঙা ঢেউগুলোর মাথায় জ্বলছে ফসফরের আলো, যেন পাড় কামড়ে ছিঁড়ে ফেলবার চেষ্টা করছে ঢেউগুলো, আর ফেনিল জলের মতো ঝিকিয়ে উঠছে ফসফর—মনে হয় তীরে যেন রাশি-রাশি আলোর পোকা কোনো রাক্ষুসে খিদেয় হন্যে হ'য়ে বেড়াচ্ছে।

গড়ানো বাঁকা রাস্তা পেরিয়ে দুজনে এগিয়ে গেলেন; বেয়নেটের ফলার মতো রাস্তায় বেরিয়ে আছে চোখা নুড়িপাথর—পায়ের নিচে তারা শব্দ ক'রে প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

কুত্তাটা তার প্রভুর গা ঘেঁষে যাচ্ছে; একবার মুখ তুলে তাকিয়ে বোধহয় বলতে চাচ্ছিলো, 'বাপু। একশো কুড়ি ফ্রেৎজের সিন্দুকে তুলবে! টাকা করবার এটাই উপায়! তোমার আঙুরখেত বাড়বে আরো কয়েক একর! নৈশভোজের সময় আরো-একটা নতুন তরকারি যোগ হবে খাদ্যতালিকায়! বিশ্বাসী হুরজোফের জন্যেও আরেক মুঠো তলানি জুটবে! যত পারো রক্ত শুষে নাও—রক্ত নয়, টাকাই—বাপু হে! সব ধনী পঙ্গুদের দোহন ক'রে নাও সময় থাকতে-থাকতে।'

বুড়িটা হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। কাঁপা আঙুলের ছায়ার মধ্যে একটা রাঙা আলো দেখিয়ে দিলে সে। অকম্মার ধাড়ি ফোর্ট কার্টিফের বাড়ি।

'ওই বাড়ি?' ডাক্তার জিগেশ করলেন।

হ্যাঁ।' বুড়ি ঘাড় নাড়লো।

'ঔ-ঔ—ঔ!' কুত্তাটা ডুকরো উঠলো।

হঠাৎ আগুনের পাহাড় গুমগুম ক'রে গ'র্জে উঠলো। যেন পাহাড়টার

ভিতরটাই হঠাৎ ন'ড়ে উঠেছে ; বুঝি-বা ভূমিকম্পই হবে, এত জোরে মাটি কাঁপছে। বিদ্যুতের মতো লকলকে জিভ বার ক'রে আগুন একবার আকাশ চেটে নিলে শিখর থেকে—ধারালো জিভে ছিঁড়েই ফেললো বুঝি-বা মেঘকে! ভূমিকম্পের চোটে ট্রিফুলগাস মুখ থুবড়ে প'ড়ে গেলেন মাটিতে।

খ্রীস্টানদের ধর্মপুত্রের মতো শপথ উচ্চারণ ক'রে টলতে-টলতে উঠে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখলেন ট্রিফুলগাস।

বুড়িকে আর পাশে দেখা যাচ্ছে না। মাটি তাকে হা ক'রে গিলে ফেলেছে নাকি—না কি ওই ছায়ায় ঘুরুনির মধ্যে সে উড়ে গিয়েছে?

কুত্তাটা তেমনি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে, জিভ বেরিয়ে পড়েছে, চোয়ালটা ঝোলা। লণ্ঠনটা নিভে গিয়েছে।

'চল্!' গুনগুন ক'রে বললেন ডাক্তার।

একশো ফ্রেৎজের আগাম নিয়েছেন ডাক্তার। রুগী দেখে টাকাটা তাঁকে অর্জন করতেই হবে।

৬

ঝাপশা একটা আলো, এখনো অন্তত আধ কের্ট্সে দূরে। মুমূর্ষু লোকটার ঘরের বাতি ওটা—না কি সে এতক্ষণে ম'রেই গেছে! ওটাই তো বাড়িটা, বুড়ি আঙুল তুলে দেখিয়েছিলো। ভুল করবার কোনো সুযোগ নেই।

হাওয়ার শিস আর বৃষ্টির মুষলধারের মধ্যে ডাক্তার ট্রিফুলগাস দ্রুত ছুটলেন।

কাছে আসতেই বাড়িটা স্পষ্ট দেখা গেলো: ফাঁকা জায়গায় একটাই বাড়ি—একা বাড়ি। অনেকটা ডাক্তারের নিজের বাড়ির মতোই দেখতে। ঠিক লুকট্রোপের ছয়-চারের মতো দেখাচ্ছে। সামনে ঠিক একই ধরনের জানলা, তেমনি ছোট্ট দরজা—হুবহু একরকম।

ঝড়ের মধ্যে যতটা তাড়াতাড়ি পারা যায় ডাক্তার ট্রিফুলগাস এগিয়ে এলেন। দরজাটা হাট-করা; একটু ধাক্কা দিয়ে আধভেজানো একটা পাল্লা সরিয়ে ভিতরে ঢুকতেই ঝড় মস্ত জোরে শব্দ ক'রে দরজাটা তাঁর পিছনে বন্ধ ক'রে দিলে।

পোষা হরজোফ বাইরেই প'ড়ে রইলো' শুধু মাঝে-মাঝে ডুকরে-ডুকরে উঠছে, আবার চুপ ক'রে যাচ্ছে—যেন গির্জেয় গানের সময় ছেলেরা এককেবার

কখনো ভুল সুরে কখনো ঠিক সুরে স্তবগানে গলা মেলাবার চেষ্টা করছে।

আশ্চর্য! যে-ই দেখবে সে-ই বলবে ডাক্তার ট্রিফুলগাস বুঝি নিজের বাড়িতেই ফিরে এসেছেন! কিন্তু তাঁর কোনো ভুল নেই। পাশ ফিরে নিজের বাড়িতেই তিনি ফিরে আসেননি। ওটা যে লুকট্রোপ নয়, ফান কারনিউ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অথচ একই রকম ঢাকা বারান্দা বাড়ির মধ্যে তেমনি নিচু কড়িকাট, কাঠের সিঁড়িটাশুদ্ধু হুবহু এক রকম—অনেক লোকের হাতের ভারে রেলিংগুলো জীর্ণ হ'য়ে পড়েছে।

উপরে উঠে গেলেন ডাক্তার; বারান্দা পেরুতেই দরজা, ভিতরে আলো জ্বলছে—ঠিক যেন ছয়-চার!

দুঃস্বপ্ন দেখছেন নাকি? মতিভ্রম, না চোখের ভুল? ক্ষীণ আলোয় তিনি হলদে সোফাওলা নিজের ঘরটা চিনে নিতে পারলেন: ডানদিকে ওই তো আদ্যিকালের সেই ওককাঠের সিন্দুকটা; বাঁদিকে লোহায় বাঁধানো সেই সিন্দুকটা, যেটায় ওই একশো কুড়ি ফ্রেংজের রাখবেন ব'লে তিনি স্থির করেছিলেন। ওই তো তাঁর আরামকেদারা, চামড়ার কুশনে ঢাকা; ওই তাঁর বাঁকানো পায়াওলা টেবিলটা, আর তার পাশে টিমটিমি বাতির আলোয় নিজের 'মেটিরিয়া মেডিকা'টা তিনি চিনতে পারলেন—তেমনি ১৯৭ পাতাতেই খোলা প'ড়ে আছে।

'কী হ'লো আমার?' নিজেকে ডাক্তার জিগেশ করলেন।

সত্যি, তাঁর হ'লো কী? ভীষণ ভয় পেয়ে গেছেন, চোখের তারা দুটি বিস্ফারিত। শরীরটা যেন কুঁকড়ে পাক খেয়ে যাচ্ছে। এই কনকনে ঠাণ্ডাতেও সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গিয়েছে। মনে হ'লো মাথার চুলগুলো সব কাঁটা দিয়ে খাড়া-খাড়া হ'য়ে উঠলো।

না, আর দেরি করা চলে না। তেল ফুরিয়ে এসেছে, টিমটিমে হ'য়ে নিভে যাচ্ছে, মুমূর্ষুও বুঝি শেষ নিশ্বাস ফেলবে এক্ষুনি!

হ্যাঁ, ওই তো বিছানা—তাঁর নিজের বিছানা, তেমনি চাঁদোয়া টাঙানো, ঝুলন্ত মশারিটা তেমনি মস্ত-মস্ত ফুল এঁকে শৌখিনভাবে তৈরি করা। সেই অকম্মার ধাড়িটার বিছানা কি আর এ-রকম হ'তে পারে?

কাঁপা হাতে ডাক্তার মশারি তোলবার চেষ্টা করলেন। কোনোরকমে মশারি তুলে ভিতরে তাকালেন ডাক্তার।

মুমূর্ষু লোকটার মাথা চাদরের মধ্যে থেকে অদ্ভুতভাবে বেরিয়ে এসেছে, প'ড়ে আছে সে, যেন একটা লাশ, যেন এক্ষুনি শেষ নিশ্বাস ফেলবে।

ডাক্তার লোকটার উপর ঝুঁকে পড়লেন।

তারপর সে কী চীৎকার! তার সঙ্গে পাল্লা দিয়েই বাইরে থেকে এলো কোনো কুকুরের অপার্থিব ডুকরে কান্নার শব্দ!

যে-লোকটা ম'রে যাচ্ছে সে ফার্ল কারনিউর সেই অকম্মার ধাড়ি ফোর্ট কার্টিফ নয়! এ যে ডাক্তার ট্রিফুলগাস স্বয়ং! তাঁরই তাহ'লে থ্রম্বসিস হয়েছে, স্ট্রোকটা তবে তাঁরই হয়েছে! মাথার শিরায় রক্ত উঠে ছিঁড়ে গেছে হঠাৎ, সঙ্গে-সঙ্গে নিম্নাঙ্গে শুরু হয়েছে পঙ্গুতা, যাকে বলে সন্ন্যাসরোগ——এক ভয়ংকর ধরনের শিরঃপীড়া!

হ্যাঁ! তাঁরই জন্য লোক পাঠানো হয়েছিলো। তাঁর নিজের রোগের জন্যই তিনি একশো কুড়ি ফ্রেৎজের দর্শনী পেয়েছেন। তিনি—তিনিই একান্ত-ভাবে হৃদয়হীন ব'লে সেই অকম্মার ধাড়ির চিকিৎসা করতে যেতে রাজি হননি। এবং মরতে যে বসেছে, সে আর কেউ নয়, তিনি ছয়-চারের ডাক্তার ট্রিফুলগাস!

পাগলের মতো লাগলো নিজেকে। যেন তিনি হেরে গেছেন, হারিয়ে গেছেন। রোগের শেষ দশার লক্ষণগুলো সব একে একে ফুটে উঠছে। স্পষ্ট বুঝতে পারছেন ক্রমেই শরীরের সব শক্তি হারিয়ে যাচ্ছে! বন্ধ হ'য়ে আসছে হৃৎপিণ্ডের ঢিপঢিপ, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, নাড়িটাও থেমে এলো! অথচ কিছুতেই তিনি ভুলতে পারলেন না তিনি কে। জ্ঞান আছে এখনো একটু-একটু।

কী করবেন তিনি এখন? শিরা কেটে রক্ত বার ক'রে দিয়ে রক্তের চাপ কমিয়ে ফেলবেন? একটু ইতস্তত করলেই আর রক্ষে নেই—তাঁর হ'য়ে এসেছে।

তখনকার দিনে রক্তচাপ কমাবার জন্য শিরা কেটে দেয়া হ'তো। তাতে যারা বাঁচবার তারা বাঁচতো—ডাক্তাররা ভাবতেন বুঝি-বা অতিরিক্ত রক্ত বার ক'রে দেবার জন্যেই রোগী বেঁচে উঠেছে!

তাঁর ডাক্তারি বাক্সটা আঁকড়ে ধরলেন ডাক্তার ট্রিফুলগাস, একটা ধারালো ছুরি বার ক'রে আনলেন—তাঁর প্রতিমূর্তির বাহুমূলে একটা ছ্যাঁদা ক'রে দিলেন তিনি। ততক্ষণে তাঁর নিজের বাহুতেই রক্তচলাচল বন্ধ হ'য়ে গেছে। তাঁর প্রতিমূর্তির বুকটা প্রাণপণে ড'লে দিতে লাগলেন ডাক্তার—কিন্তু তাঁর নিজের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হ'য়ে এলো। তাঁর প্রতিমূর্তির পায়ের তলায় সেঁক দিলেন তিনি—কিন্তু তাঁর নিজের পা দুটি ঠাণ্ডা আর অসাড় হ'য়ে উঠলো।

তারপরই তাঁর প্রতিমূর্তি হঠাৎ হ্যাঁচকা টানে খাড়া হ'য়ে উঠে বসলো বিছানায়, শূন্যে হাত তুলে কার সঙ্গে যেন যুঝতে চাচ্ছে সে ; উঠলো একটা ভীষণ ঘড়ঘড় ধ্বনি-মরবার সময়কার গোঙানি সেটা।

আর ডাক্তার ট্রিফুলগাস, চিকিৎসাশাস্ত্রের সমস্ত শিক্ষা সত্ত্বেও, নিজের হাতেই নিজে মারা গেলেন—কিছুতেই কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারলেন না।

টুপটাপ···টুপটাপ···

৭

পরের দিন সকালে ছয়-চারের বাড়িতে তারা একটাই লাশ পেলে—শুধু ডাক্তার ট্রিফুলগাসেরই মৃতদেহ। অন্ত্যেষ্টির জন্য মহাসমারোহে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হ'লো লুকট্রোপের কবরখানায়—আগে তিনি নিজেই কত লোককে পাঠিয়েছেন এখানে। খুব জ াঁকজমক করে যথাবিধি তাঁকে গোর দেয়া হ'লো।

আর হরজোফ? লোকে বলে তাকে নাকি এখনও ঝড়ের রাতে দেখা যায়—মুখে লণ্ঠন নিয়ে দূরদূরান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর মাঝে-মাঝে ডুকরে উঠছে। তার আত্মার যেন আর মুক্তি নেই।

সত্যি-মিথ্যে জানি না। ফোলসাইনে কত কী অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে! বিশেষ ক'রে লুকট্রোপের আশপাশে তো কথাই নেই!

তবে আরেকবারও বলি, আমি হ'লে কক্‌খনো মানচিত্রে এই লুকট্রোপকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করবো না। ভৌগোলিকদের মধ্যে কেউই এখনও ঠিক ক'রে এর অক্ষরেখা নির্ণয় করতে পারেননি—দ্রাঘিমাও নয়।

অবশেষে যখন ফ্রাঙ্কফুর্টে পৌঁছলুম তখন সেপ্টেম্বর মাস। বছরটা ১৮৫ খ্রীস্টাব্দ। জার্মানির নামজাদা নগরগুলি পেরিয়ে আসার সময় অনেকবারই বেলুনে চেপে আকাশে উঠতে হয়েছিলো আমাকে। আর সেই জন্যেই, আমি যে প্রায় উড়ে-উড়েই যাচ্ছিলুম, এই তাজ্জব কাণ্ডের জন্য, আমার যাবার পথটা উজ্জ্বলভাবে চিহ্নিত হয়েছিলো। কিন্তু তখনও অবিশ্যি কোনো জার্মানই আমার বেলুনে ক'রে আকাশে ওড়েনি; মাদাম গ্রিন, ইউজিন গদার আর পোয়েৎভঁর তাকলাগানো সব গবেষণা ও কাণ্ডকারখানা তখনও এই গম্ভীর টিউটন জাতিকে ততটা উৎসুক ক'রে তোলেনি ব'লেই আকাশে ওড়বার জন্য তাদের মোটেই তেমন আগ্রহ ছিলো না।

কিন্তু যেই ফ্রাঙ্কফুর্টে আমার আসন্ন বেলুনযাত্রার কথা ছড়িয়ে পড়লো, অমনি তিনজন সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত নাগরিক আমার সঙ্গে বেলুনে ওঠবার জন্য অনুমতি চাইলেন। প্লাস দ্য লা কমেদি থেকে দু-দিন পরে আমরা রওনা হবো ব'লে ঠিক হ'লো, আর আমিও তক্ষুনি আমার বেলুনটাকে ঠিকঠাক করতে লেগে গেলুম। রেশমে তৈরি বেলুন—কোনো অ্যাসিড বা গ্যাস যাতে তার কোনো ক্ষতি করতে না পারে সেইজন্য তার উপর একটা গাটাপার্চার আবরণ দেয়া (জানেন নিশ্চয়ই যে, গাটাপার্চা আসলে নানা রকম গাছের জমাট আঠা ছাড়া আর-কিছুই নয়); তার আয়তন হচ্ছে তিন হাজার ত্রিঘাত গজ, আর ঘনফলের পরিমাণটা নেহাৎ কম ছিলো না ব'লেই বেলুনটা অনায়াসেই অনেক উঁচুতে উঠে যেতে পারতো।

সেপ্টেম্বরে মস্ত একটা মেলা বসে ফ্রাঙ্কফুর্টে—অনেক দূর-দূর জায়গা থেকেও লোক আসে। স্থির হ'লো, ওই মেলার দিনেই আমার বেলুন উড়বে। ভাগ্য ভালো, গ্যাস পেয়ে গেলুম চমৎকার: অত্যন্ত ভালোজাতের গ্যাস, উর্ধ্বচারিতাও বিপুল, তাই খুব ভারি জিনিশকেও শূন্যে টেনে তুলতে পারে। বেলা এগারোটার মধ্যেই বেলুনে ওই গ্যাস ভ'রে ফেলা হ'লো—অবশ্য পুরো বেলুনটায় নয়, মাত্র তার তিন চতুর্থাংশে: সাবধানের মার নেই—এই আপ্তবাক্য মনে রেখেই এটুকু সতর্কতা; কারণ বেলুন যত ওপরে ওঠে আবহমণ্ডলের ঘনাঙ্কও ততই ক'মে যেতে থাকে—আর সে সময় বেলুনের

ভিতরকার বায়ব শক্তি আরো ফেঁপে গিয়ে যখন-তখন ফেটে যেতে পারে। সঙ্গীদের নিয়ে আকাশে উড়তে ঠিক কতটুকু গ্যাস লাগবে, সেটা আমি আগেই নানা অনুগণনার পর নির্ভুল বের করেছিলুম।

রওনা হবার কথা কাঁটায়-কাঁটায় বারোটায়। বেলুনটা ছিলো একটা ঘেরাও-করা জায়গায়ঃ আর চারপাশে অধীর ও কৌতূহলী মানুষের ভিড়। এই ভিড় দেখে মাঝে-মাঝে আমার নিজেরই বেশ অবাক লাগতো। সামনের চৌমাথা আর পুরোদ্যান থেকে শুরু ক'রে এমনকি আশপাশের রাস্তাতেও আর তিল ধারণের জায়গা ছিলো না—সে কী গিশগিশে ভিড় আর ঠেলাঠেলি ঃ আশপাশের বাড়িগুলোর ওপর-নিচে অলিন্দে-গম্বুজে এক চিলতে জায়গাও আর বাকি নেই; সবখানেই অস্থির ও উৎসুক লোক; কখন বেলুন ছাড়ে, সেইজন্যে সবাই কী উদ্‌গ্রীব হ'য়ে অপেক্ষা করছে! গত কয়েকদিন বাতাস বেশ জোরে বইছিলো—কিন্তু আজ আর হাওয়ার সেই প্রবলতা নেই ঃ আকাশ নির্মেঘ, জলজলে রোদজ্বলা স্বচ্ছ দিন। ফলে বেশ গরমই লাগছিলো। হাওয়া এমনি স্তব্ধ হ'য়ে আছে যে আবহমণ্ডলে যেন প্রাণের কোনো সাড়াই নেই। এ-রকম আবহাওয়ায় আবার বেলুন যেখান থেকে ছাড়ে, ঠিক সেই-খানেই হঠাৎ নেমে পড়তে পারে।

বেলুনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য বেলুনের মধ্যে অনেক ভারি জিনিশ তুলে নিতে হয়ঃ অনেকগুলো থলিতে ক'রে আমি সবশুদ্ধ তিনশো পাউণ্ড ওজনের নুড়ি-পাথর তুলে নিয়েছিলুম। বেলুনের দোলনাটা গোল, আর তার ব্যাস মোটমাট চার ফুটঃ কোনো কষ্ট বা অসুবিধে যাতে না-হয়, সেইজন্য তা খুবই যত্ন নিয়ে সাজানো হয়েছিলো। বেলুনের ঊর্ধ্ব গোলার্ধ থেকে সুসমঞ্জসভাবে শক্ত রেশমি দড়ি নেমে এসে দোলনাটাকে আঁকড়ে ধ'রে আছেঃ যথাস্থানে রয়েছে দিগ্‌দর্শিকা; ঝোলানো দড়িগুলো যেখানে গিয়ে এক জায়গায় মিশেছে, সেখানটা বৃত্তের মতো গোল—আর তাপমানযন্ত্রটি আছে সেইখানেই। নোঙরটাকে সযত্নে ঠিক ক'রে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ আকাশে ওড়বার সব ব্যবস্থাই তখন ঠিকঠাক।

চারপাশের রেলিঙের গায়ে হুমড়ি খেয়ে এসে পড়েছে ভিড়, কৌতূহলে ও উত্তেজনায় তারা কী-রকম যেন অধীর হ'য়ে আছে। হঠাৎ তাদের মধ্যে একটি যুবকের উপর আমার চোখ পড়লোঃ তার মুখ পাণ্ডুর, চোখদুটি অস্বাভাবিক চক্‌চকে—দেখেই বোঝা যায় ভীষণ উত্তেজিত হ'য়ে আছে। কেন জানি না সে আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করলে। কেননা

তাকে দেখেই মনে প'ড়ে গেলো যে এর আগেও জর্মানির অন্যান্য নগরে বেলুনে ওঠবার আগে ভিড়ের মধ্যে তাকে চোখে পড়েছে, আমার আকাশভ্রমণের সে একজন অত্যন্ত উৎসুক দর্শক। মনে হ'লো, আমার এই অদ্ভুত নভোচারী দেখে তার ভিতরে যেন বিষম অস্বস্তি জেগেছে—কিন্তু তবু সে কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারছে না, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে বেলুনটির দিকে। বেলুনটি তখন মাটি থেকে কয়েক ফুট ওপরে স্তব্ধ দাঁড়িয়ে আছে। ভিড়ের মধ্যে হৈহল্লা, কিন্তু এই যুবকটির মুখে কোনো কথা নেই, সে যেন সম্মোহিত, আবিষ্ট, চিন্তাকুল—আশপাশের অধীর ও কৌতূহলী মানুষদের কথা যেন সে একেবারেই ভুলে গিয়েছে।

বারোটা বেজে গেলো ; নোঙর তোলবার সময় হ'লো, কিন্তু তবু আমার সঙ্গীদের কোনো পাত্তা নেই।

বাড়িতে লোক পাঠালুম খোঁজ নিতে ; জানা গেলো, তিনজনের কেউই এই মুহূর্তে ফ্রাঙ্কফুর্টে উপস্থিত নেই : একজন গেছেন হামবুর্গে, আরেকজন ভিয়েন-এ, তৃতীয়জন লনডনে। গোড়ায় খুব হাম্বড়া ভাব করলেও শেষ মুহূর্তে আকাশে উড়তে গিয়ে তাঁদের সাহসে কুলোয়নি। কী আর বলবো ? আমি তো জানি যে আধুনিক বৈমানিকদের কল্যাণে আকাশভ্রমণ এখন আর মোটেই তেমন মারাত্মক নয়। যেহেতু তাঁরা বেলুনে ক'রে আকাশে উড়বেন ব'লে প্রচার করেছিলেন, যেহেতু এই নভোচারিতা তাঁদের আজকের কর্মসূচির অন্তর্ভূত ছিলো, সেইজন্য পাছে শেষটায় সত্যিই তাঁদের জোরজুলুম ক'রে বেলুনে উঠিয়ে দেয়া হয়, এই ভয়ে তিনজনেই বেলুনে গ্যাস ভরবার সময় নগর ছেড়ে পালিয়েছেন। স্পষ্টই বোঝা গেলো তাঁদের এই হুড়মুড় পলায়নের গতি তাঁদের সাহসের ঠিক বিপরীত।

এইভাবে প্রতারিত হ'য়েও সমবেত জনতা কিন্তু কোনো বিক্ষোভ প্রকাশ করলো না। আমি আর কোনো ইতস্তত না ক'রে একাই বেলুনে উঠে পড়লুম। বেলুনের আপেক্ষিক গুরুত্ব আর ওজনের মধ্যে সমতা আনবার জন্য আরো কয়েক বস্তা বালি চাপিয়ে দিলুম বেলুনে—ওই তিনজন এভাবে কেটে না-পড়লে তার অবশ্য মোটেই দরকার হ'তো না। আমি দোলনায় উঠে দাঁড়াতেই চারপাশে যে বারোজন লোক বেলুনের বারোটা দড়ি ধ'রে বৃত্তের মতো দাঁড়িয়েছিলো, তারা আস্তে-আস্তে দড়ি ছেড়ে দিলে : বেলুনটি আরো কয়েক ফুট ওপরে উঠে গেলো। মোটেই হাওয়া নেই, আবহমণ্ডল যেন সিসের মতো ভারি। হয়তো আজ বেলুনে না উঠলেই ভালো ছিলো!

চেঁচিয়ে জিগেশ করলুম, 'সব ঠিক আছে তো?'

লোকেরা সবাই তৈরি হ'য়ে দাঁড়ালো। শেষবার চারপাশে তাকিয়ে সব ভালো ভাবে নিরীক্ষণ ক'রে এবার রওনা হওয়া যায়।

'প্রস্তুত!'

হঠাৎ যেন ভিড় বিষমভাবে দুলে উঠলো, যেন সবাই ওই ঘেরা জায়গাটায় ঢুকে পড়তে চাচ্ছে।

'দড়ি ছেড়ে দাও!'

বেলুন খুব আস্তে-আস্তে ওপরে উঠতে লাগলো, কিন্তু হঠাৎ এক ধাক্কায় দোলনার মধ্যে ছিটকে পড়লুম।

উঠে দাঁড়িয়ে দেখি, বেলুনের মধ্যে আর একা নই, আমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে এক অপ্রত্যাশিত সহযাত্রী—সেই পাণ্ডুবর্ণ যুবকটি।

অত্যন্ত ঠাণ্ডা ও স্থির গলায় যুবকটি বললে, 'আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি মঁসিয়···'

'কোন অধিকারে—'

'এই বেলুনে উঠেছি? এখন আর আপনি তাড়াতে পারবেন না, সেই অধিকারে।'

আমি তো স্তম্ভিত ও হতবাক! তার এই শান্তশিষ্ট ভঙ্গিই আমাকে ঘায়েল ক'রে দিলে: এত ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিলুম যে কোনো উত্তর হাৎড়ে পাচ্ছিলুম না। আমি হাঁ ক'রে তার দিকে তাকিয়ে আছি, মুখে টুঁ শব্দটি নেই, কিন্তু আগন্তুক যেন আমার হতচকিত ভাব গ্রাহ্যই করলে না।

'আমার জন্যে কি বেলুনের ভারের সমতা নষ্ট হ'য়ে গেলো?' সে জিগেশ করলে, 'মঁসিয় যদি অনুমতি করেন—'

এই ব'লে সম্মতির কোনো অপেক্ষা না-ক'রেই সে দুটি বালির বস্তা শূন্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

'মঁসিয়', আমার কাছে তখন একটাই পথ খোলা ছিলো, 'আপনি যখন বেলুনে উঠেই পড়েছেন, তখন আর কী করা যাবে—থাকুন। কিন্তু বেলুনটাকে নিয়ন্ত্রণ করার সব দায়িত্ব ও অধিকার আমার, এটা শুধু মনে রাখবেন।'

যুবকটি বললে, 'মঁসিয়, আপনার আতিথেয়তা সত্যি পুরোদস্তুর ফরাশি—আমার মাতৃভূমি থেকেই এই গুণ পেয়েছেন আপনি। কাজেই আপনি না-চাইলেও আমি আপনার করমর্দন করতে বাধ্য। আপনি যা যোগ্য ব'লে বিবেচনা করবেন, তা-ই করবেন; যত সাবধান হ'তে চান, হোন। আমি

না-হয় আপনার কাজ শেষ না-হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করি—'

'কেন? কিসের জন্য?'

'বাঃরে, আপনার সঙ্গে আলাপ করবো না বুঝি?'

তাপমানযন্ত্র ছাব্বিশ ইঞ্চি নেমে এসেছে; আমরা এখন ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরের ছশো গজ ওপরে উঠে এসেছি; কিন্তু বেলুন থেকে দিগন্ত ঠিক একরকমই দেখাচ্ছে, কারণ বাতাসের যে-ভরের মধ্যে সে বন্দী হ'য়ে আছে, বেলুন এগোলে সেও তখনি এগিয়ে যাচ্ছে। নিচের সব-কিছু কেমন মলিন, কেমন আধো-আলোয় আধো-ছায়ায় ঢাকা ব'লে মনে হচ্ছে। হালকা একটুকরো মেঘ হঠাৎ বেলুনের নিচে সব-কিছু ঢেকে দিলে—কিছুই আর স্পষ্ট দেখা গেলো না।

আবার নতুন ক'রে সহযাত্রীটির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে দেখলুম।

বয়েস মোটামুটি ত্রিশ হবে, গায়ে শাদাশিধে পোশাক। ধারালো চেহারা, দেখেই বোঝা যায় গায়ে প্রচণ্ড শক্তি—অত্যন্ত পেশীবহুল সুঠাম দেহসৌষ্ঠব। আমি যে তাকে দেখে খুবই অবাক হ'য়ে গেছি, এটা যেন তার গায়েই লাগছে না; সে দিব্যি ব'সে আছে উদাসীন ও নির্বিকার; চুপচাপ ব'সে নিচের দিকে তাকিয়ে ঝাপশা জিনিশগুলোকে চেনবার চেষ্টা করছে। একটু পরে নিজেই ব'লে উঠলো, 'হতচ্ছাড়া কুয়াশা!'

আমি তাকে কিছুই বললুম না।

'বাঃ রে! এখনও আপনি আমার ওপর রাগ ক'রে ব'সে আছেন? কিন্তু আমার অবস্থাটাও একটু বিবেচনা করুন। আমি তো আর বেলুনে ক'রে ওড়বার জন্য আপনাকে ভাড়া দিতে পারতুম না—তত টাকাই আমার নেই—কাজেই আপনাকে অমন চমকে দেয়া ছাড়া আর কীই বা করতে পারতুম, বলুন!'

'আপনাকে তো কেউ নেমে যেতে বলেনি!'

'হ্যাঁ, তা ঠিক! আপনি কি জানেন না যে ১৭৮৪ সালের ১৫ই জানুয়ারি লেবেন্সঁ আর দাম্পিয়ের কাউন্টরা যখন লিয়ঁ থেকে বেলুনে উঠেছিলেন, তখন এমন একটি ঘটনা ঘটেছিলো? ফঁতান নামে এক ছোকরা ব্যবসাদার বেড়া ডিঙিয়ে এসে হঠাৎ বেলুনটায় চেপে বসেছিলো। শেষ অব্দি সে অবিশ্যি আকাশভ্রমণ ক'রেও ছিলো, আর তাতে কারুরই কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি।'

এ-রকম হালকা কথাবার্তা শুনে একটু রুষ্টই হ'য়ে উঠলুম। 'আমি অবশ্য নামবার পর এর একটা কৈফিয়ৎ চাইবো।'

'অমন ক'রে বলবেন না—'

আপনি কি ভাবছেন আমি বেলুনে ক'রেই উড়ে বেড়াবো ? আর কখনো নামতে চাইবো না ?'

'নামবেন ?' যুবকটি যেন অতিমাত্রায় আশ্চর্য হলো, 'আগে তো ওপরে উঠি, তারপর দেখা যাবে।' ব'লেই সে বাধা দেবার আগেই দোলনা থেকে আরো দুটি বালির বস্তা নিচে ফেলে দিলে।

'মঁসিয় !' রাগে আমার বাক্‌রোধ হবার জোগাড়।

অচেনা যুবকটি বললে, 'ভাববেন না—আপনার দক্ষতার কথা আমি জানি। আপনার আকাশভ্রমণের কথা খুবই বিখ্যাত হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু অভিজ্ঞতার সঙ্গে অভ্যাসের যদি সহোদর সম্বন্ধ থাকে, তাহ'লে তত্ত্বের সঙ্গেও তার আত্মীয়তা মোটেই কম নেই। নভোচারিতা নিয়ে আমি বিস্তর পড়াশোনা করেছি—আমার রক্তে তা মিশে গিয়েছে।' তার গলা কেমন বিষন্ন হ'য়ে এলো ঃ হঠাৎ চুপ ক'রে গিয়ে গভীরভাবে সে কী যেন ভাবতে লাগলো।

অনেক উঁচুতে উঠে গিয়ে বেলুন তখন একটি জায়গায় স্থির ভেসে আছে। তাপমানযন্ত্র দেখে অজ্ঞাত যুবকটি ব'লে উঠলো, 'তাহ'লে এতক্ষণে আটশো গজ উঠেছি! নিচের মানুষদের পোকার মত দেখাচ্ছে—দেখছেন ? আমার মনে হয় মানুষকে নির্ভুল বিচার করার জন্য অনেক উঁচু থেকেই তাকানো উচিত। প্লাস দ্য লা কমেদিকে এখন ঠিক একটা পিঁপড়ের স্তূপ ব'লে মনে হচ্ছে। জেটির ভিড়ের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন—কী, পিঁপড়ের মতো দেখাচ্ছে না ? পাহাড়গুলো পর্যন্ত কেমন ছোটো হ'য়ে যাচ্ছে। গির্জের ঠিক ওপরটাতেই আছি আমরা ঃ মাইন নদীকে একটা সরু রেখার মতো দেখাচ্ছে—যেন শহরটার মাঝখান দিয়ে কেউ একটা রেখা টেনে দিয়েছে ;—আর সেতুটাকে দেখাচ্ছে একটা সুতোর মতো—এই সুতোটা নিয়ে কেউ যেন দুই তীরকে বেঁধে দিতে চাচ্ছে।'

আবহাওয়া হঠাৎ বেশ ঠাণ্ডা হ'য়ে এসেছে।

'আপনার জন্য করতে পারি না, এমন কিছুই নেই', রহস্যময় লোকটি বললে, 'ঠাণ্ডা লাগছে আপনার ? বলুন, তাহ'লে আমার কোট খুলে দিই আপনাকে।'

শুকনো গলায় বললুম, 'ধন্যবাদ !'

'বারে! এটা তো ঠিক যে আতুরে নিয়মো নাস্তি! দেখি, হাতে হাত দিন। আপনারই স্বদেশীয় আমি ঃ আমার সঙ্গে আছেন ব'লে ভাবছেন

আপনার পুরো সময়টাই নষ্ট হবে? নাঃ, তা হবে না—তা থেকে কিঞ্চিৎ জ্ঞানার্জনও করতে পারবেন। হঠাৎ এসে চড়াও হ'য়ে আপনাকে যে-ঝামেলায় ফেললুম, আমার কথাবার্তায় অন্তত তার খানিকটা ক্ষতিপূরণ হবে।'

কোনো উত্তর না-দিয়ে দোলনার একেবারে অন্য কোনায় গিয়ে বসলুম। যুবকটি ততক্ষণে তার লম্বা ওপর-কোটের পকেট থেকে একটা মস্ত পাণ্ডুলিপি বার ক'রে ফেলেছে; বেলুনবিদ্যা সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত গবেষণাই হবে সেটা। 'যা-কিছু—আকাশ যাদের ডেকেছিলো তাদের সম্বন্ধে যা-কিছু—লেখা হয়েছে, তাদের নিয়ে যত হাসিঠাট্টা ও ক্যারিকেচার করা হয়েছে, তার একটা আশ্চর্য সংগ্রহ আছে আমার কাছে। বেলুনের মতো আশ্চর্য আবিষ্কারকে নিয়ে লোকে যেমন প্রশংসাও করেছিলো, তেমনি ঠোঁট বেঁকিয়ে ঠাট্টাও করেছিলো! মঁৎগোলফিয়ের তাঁর আমলে বাষ্প দিয়ে নকল মেঘ বা তড়িৎজলা গ্যাস বানাবার চেষ্টা করতেন—ভাগ্যিস এখন আর সে-রকম করতে হয় না—ভিজে খড় আর পশম পুড়িয়ে এখন ভাগ্যিশ আর কৃত্রিম মেঘ তৈরি করতে হয় না কাউকে।'

'কী বলতে চাচ্ছেন আপনি? আবিষ্কারকদের কারু কোনো প্রতিভা ছিলো না, সব বুজরুকি, সব ধাপ্পা—আপনি এ-কথাই বলতে চাচ্ছেন? আকাশে যে ওড়া যায়, এটা হাতে-কলমে প্রমাণ ক'রে দেয়াটা কি আপনার মতে ঠিক হয়নি?'

'আহা—প্রথম বৈজ্ঞানিকদের গৌরব ও মহিমাকে কে অস্বীকার করতে চাচ্ছে? তপ্ত বাতাসভরা ওইসব ঠুনকো বেলুনে ক'রে আকাশে উড়তে যথেষ্ট বুকের পাটা লাগে। কিন্তু জিগেশ করি, ব্ল াঁশার যেদিন আকাশে উড়েছিলেন, তারপরে কি বিমানবিদ্যার তেমন উন্নতি হয়েছে? আর ব্লাঁশার তো প্রায় একশো বছর আগেকার মানুষ। আচ্ছা, এই-যে, এটা দেখুন,' ব'লে অজ্ঞাত যুবকটি তার চামড়ার ব্যাগ থেকে একটা রেখাচিত্র বার ক'রে দেখালো।

'এই দেখুন। বেলুন আবিষ্কার করার চার মাস পরে পিয়েতর দ্য রসিয়ে আর মার্কি দ্য আরলাঁদ আকাশে ওড়বার প্রথম যে চেষ্টা করেছিলেন, এটা তারই ছবি। এই চেষ্টায় ষোড়শ লুইয়ের একটুও সম্মতি ছিলো না—মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে, এমন দুটি লোককে বেলুনে চাপিয়ে আকাশে ওড়বার চেষ্টা চালাতে বলা হয়েছিলো। এই বেয়াক্কেলে অবিচারে পিয়েতর দ্য রসিয়ে তো খেপেই আগুন: অনেক ফন্দি ফিকির ক'রে ও চারপাশে নানাভাবে প্রভাব খাটিয়ে অবশেষে তিনি তাঁর বিমানবিদ্যার পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়

অনুমতি আদায় করেছিলেন। দোলনার ব্যাপারটা তখনো আবিষ্কার হয়নি, সেইজন্যই বেলুনকে নিয়ন্ত্রিত করা তখন আরো অনেক কঠিন ছিলো; মঁৎগোলফিয়ের-এর বেলুনের নিচের দিকের সরু অংশটায় কেবল একটা গোল আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। বৈজ্ঞানিক দুজন নিশ্চয়ই এই আসনের দু-পাশে নিশ্চল ব'সে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন, কারণ পুরোটাই ছিলো ভিজে খড়ে ভরা—আর সেইজন্য ঠিকমতো নড়াচড়া করাও যেতো না। বেলুনের খোলা মুখটার নিচেই ছিলো একটা ছোটো উনুন; বৈজ্ঞানিকরা যখনই আরো ওপরে উঠতে চাইতেন, তখনই ওই জ্বলন্ত উনুনে কিছু খড় ফেলে দিতেন, আর হাওয়া আরো গরম হ'য়ে যেতো, হালকা হ'য়ে যেতো; আর ওপরে উঠবার নতুন শক্তি দিতো। কিন্তু তাতে বেলুনে আগুন ধ'রে যাবার একটা মস্ত ভয় ছিলো। ১৭৮৩ সালের ২১শে নভেম্বর এই দুজন দুঃসাহসী আকাশযাত্রী মুয়েৎ গার্ডেন থেকে আকাশে উঠলেন—ষোড়শ লুই পরীক্ষা চালাবার জন্য ওই বীথিকাটি তাঁদের দিয়ে দিয়েছিলেন। রাজার মতো গরীয়ানভাবে আকাশে উঠেছিলো বেলুন, পেরিয়ে গিয়েছিলো মরালদ্বীপ, অধিবেশনচক্রের কাছে পেরিয়েছিলো সেন নদী, তারপর সামরিক বিদ্যালয় আর পঙ্গুদের আশ্রমের মিনারের মধ্যে বেশ আস্তে ভেসে-ভেসে সাঁৎ সুলপস গির্জের কাছে চ'লে এসেছিলো। বৈজ্ঞানিকরা নতুন জালানি ফেলে দিয়েছিলেন উনুনে, বুলভার পেরিয়ে গিয়ে তাঁরা এফার দেয়ালের কাছে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। মাটি ছোঁবার সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁদের বেলুন ফেটে গিয়েছিলো, আর পিয়েতর দ্য রসিয়ে বেলুনের রেশমের ভাঁজের মধ্যে চেতনা হারিয়ে প'ড়ে গিয়েছিলেন।'

কাহিনীটি শুনে কেমন যেন আকুল লাগলো, বললুম, 'বেচারি!'

'বেচারিই বটে, কারণ পরে তাঁকে এইভাবেই জীবন দিতে হয়েছিলো,' অচেনা লোকটির গলা বিষাদে ভ'রে গেলো, 'আপনি নিশ্চয়ই কখনো এ-রকম বিপাকে পড়েননি?'

'কখনও না।'

'দুর্ঘটনা আবার অনেক সময়ে কোনো পূর্বাভাস না-দিয়েই আসে,' ব'লে সে হঠাৎ চুপ ক'রে গেলো।

আমাদের বেলুন তখন দক্ষিণদিকে ধাবমান: নিচে এখন নতুন শহর, ফ্রাঙ্কফুর্ট আমরা পেরিয়ে এসেছি।

যুবকটি বললে, 'ঝড় আসছে বোধহয়!'

'তার আগেই আমরা নিচে নেমে যাবো।'

'তাই নাকি ? তার চেয়ে আরো ওপরে উঠে-যাওয়াই ভালো—তাহ'লে ঝড়কে পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়া যাবে।' সঙ্গে-সঙ্গে আরো দুটি ভারি বস্তা মহাশূন্যে ঘুরপাক খেতে থাকলো।

তক্ষুনি যেন এক হ্যাঁচকা টানে বেলুন আরো ওপরে উঠে গেলো। বারোশো গজ ওপরে চ'লে এসেছি আমরা,—অতটা উঠে বেলুন একটু থেমেছে। ভারি ঠাণ্ডা লাগছে আমাদের অথচ রোদ প'ড়ে ভিতরকার গ্যাস ফেঁপে যাচ্ছে, আর বেলুনের ওড়বার ক্ষমতা আরো বেড়ে যাচ্ছে।

'ভয় নেই,' অচেনা লোকটি বললে, 'এখনো সাড়ে-তিনহাজার ফ্যাদম হাওয়া আছে—শ্বাসপ্রশ্বাস নেবার পক্ষে তা-ই যথেষ্ট। তাছাড়া আমি কী করি না করি তা নিয়ে মিথ্যে অত মাথা ঘামাবেন না।'

উঠেই পড়তুম হয়তো, কিন্তু কেন যেন ভিতর থেকে কে বাধা দিলে। জিজ্ঞেশ করলুম, 'আপনার নাম ?'

'আমার নাম ? তা শুনে আপনার কী এসে যাবে ?'

'বাজে বকবেন না। আপনার নাম কী বলুন, আমি জানতে চাই।'

'ধ'রে নিন এরোস্ত্রতুস বা এম্পেদক্লেস—যা আপনার ভালো লাগে, তাই আপনি ব্যবহার করতে পারেন।'

এই উত্তরে একটুও আশ্বস্ত হওয়া গেলো না। ভারি আশ্চর্য লোকটি, কথা বলার ধরন এমন ঠাণ্ডা যে একেবারে তাজ্জব হ'য়ে যাচ্ছিলুম। কে জানে, শেষটায় কার পাল্লায় পড়লুম।

সে ব'লেই চললো, 'পদার্থবিদ শার্ল-এর পর মৌলিক কিছুই আর আবিষ্কার
হয়নি। বেলুন আবিষ্কৃত হবার চারমাস পরেই এই প্রতিভাবান মানুষটি প্রথম
ভাল্‌ভ তৈরি করেন—তার ফলে বেলুনের মধ্যে গ্যাস বাড়ানো-কমানো খুব
সহজ হ'য়ে যায়। তারপরে আবিষ্কার করেন দোলনা—তার ফলে বেলুনকে
ইচ্ছেমতো পরিচালনা করা আর দুঃসাধ্য রইলো না। তার পর আবিষ্কার
করলেন জাল—তা যে কেবল বেলুনের আবরণটিকেই ধ'রে থাকে তা নয়, তার
ওজনকেও পুরো জিনিশটার মধ্যে ছড়িয়ে দেয় ; তিনি বার করলেন বালির
বস্তা তোলবার পদ্ধতি—তার ফলে কেবল যে ইচ্ছেমতো ওঠাই সম্ভব হ'লো তা
নয়, কোন জায়গায় নামতে হবে তাও ইচ্ছেমতো স্থির করা গেলো ; বার
করলেন ইণ্ডিয়া রবার দিয়ে সমস্তটা মুড়ে দেবার উপায়—তাতে বেলুন আরো
মজবুত আর টেঁকসই হ'লো ; বেরালো ব্যারোমিটার—তার সাহায্যে বোঝা
গেলো কতটা ওপরে ওঠা গেছে। আর, সবচেয়ে যেটা বড়ো কথা, শার্ল

ব্যবহার করলেন উদ্‌যান গ্যাস—বাতাসের চেয়ে চোদ্দ গুণ হালকা ব'লে তাতে যে আবহমণ্ডলের সর্বোচ্চ স্তরে ওঠার সুযোগ হ'লো তা নয়, আকস্মিক পতনের হাত থেকেও বেলুনকে তা রক্ষা করলে। ১৭৮৩ সালের ১লা ডিসেম্বর তুইলেরি-র চারপাশে লাখ তিন-চার লোক এসে ভিড় করেছিলো। সমর-বাহিনী অভিনন্দন জানালে শার্লকে—তারপর শার্ল তাঁর বেলুনে উঠলেন। আকাশে ন-লিগ (এক লিগ হ'লো তিন মাইল) গিয়েছিলেন তিনি; এমন-ভাবে তিনি তাঁর বেলুন চালিয়েছিলেন যে আধুনিক বৈমানিকরাও কেউ তাঁর সে-দক্ষতাকে এ-পর্যন্ত অতিক্রম করতে পারেননি। রাজা তাঁকে দু-হাজার লিভার বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করলেন—তখন সত্যি নতুন নতুন আবিষ্কারকে উৎসাহ দেয়া হ'তো।

কথা বলতে বলতে লোকটি ক্রমেই উত্তেজনায় টগবগ করতে লাগলো।' 'এ-বিষয়ে বহু পড়াশুনো ক'রে এটা বুঝতে পেরেছি যে প্রথম বৈমানিকেরা তাঁদের বেলুনকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারতেন। ব্ল াশার-এর কথা বলছি না, কারণ অনেকেই তাঁর কৃতিত্বকে সন্দেহের চোখে ছাখেন। কিন্তু জুতোঁয়োর্ভোর কথা মনে ক'রে দেখুন—তিনি এমনভাবে হাল আর দাঁড় ব্যবহার করেছিলেন যে ইচ্ছেমতো দিক পরিবর্তন করা তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন ছিলো না। অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে মঁসিয় জুলিয় নামে একজন ঘড়িনির্মাতা পারীর হিবেনদ্রোমে বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন—অনেক সন্দেহকেই তিনি দূর ক'রে দিয়েছেন। বিশেষ আধিত্রের সাহায্যে তিনি তাঁর আয়তাকার উড়োযানকে স্পষ্টই বাতাসের উলটোদিকে চালিয়েছিলেন। চার-চারটে উদ্‌যান বেলুনকে একসঙ্গে ব্যবহার করার কথা প্রথম ভেবেছিলেন মঁসিয় পেতাঁ—অংশত ভাঁজ-করা অনুভূমিক পাল খাটিয়ে তিনি ভারসাম্য নষ্ট ক'রে দেবার পরিকল্পনা করেছিলেন—তার ফলে বিমানকে হেলিয়ে, কাৎ ক'রে, ঝুঁকে, তির্যকভাবে চালানো যেতো—কেবল খাড়াভাবে না-গেলেও চলতো। স্রোত বা হাওয়ায় ঘূর্ণিকে জয় করার শক্তির কথাও তাঁরা ভেবেছিলেন—একটা উপায় তাঁরা ভেবেছিলেন যে কোনো স্ক্রু বা চাকা থাকলে হয়তো কাজ দেবে। কিন্তু কোনো চঞ্চল কেন্দ্রে বসালে ঐ স্ক্রু কোনোই কাজে আসবে না। আমি—আমিই বেলুনকে নিয়ন্ত্রিত করবার, সবদিক থেকে শামলাবার একমাত্র উপায় আবিষ্কার করেছি। কিন্তু, কাণ্ড দেখুন, কোনো প্রতিষ্ঠানই আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো না—কোনো নগরই আমার জন্যে চাঁদা তোলার ব্যবস্থা করলো না—কোনো সরকারই আমার কথায় কান দিতে

চাইলো না। বিশ্রী ব্যাপার—জঘন্য, নীচ, ধিক্কারযোগ্য। লোকে এত আহাম্মক আর নিঃসাড় হয় যে ভাবলে ঘেন্না হয়!'

এমন উত্তেজিতভাবে সে হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করলে যে দোলনাটাই বুঝি উলটে যায়। শেষটায় অনেক কষ্টে তাকে একটু ঠাণ্ডা করলুম।

এদিকে বেলুন তখন এক দমকা হাওয়ায় স্রোতে গিয়ে পড়েছে। মাটি থেকে পনেরোশো গজ ওপর দিয়ে আমরা দক্ষিণমুখো এগুচ্ছি।

দোলনা থেকে ঝুঁকে নিচে তাকিয়ে আমার সহযাত্রী বললেন, 'ওই দেখুন ডার্মস্টাট। দেখতে পাচ্ছেন পল্লিনিবাস? ঝাপসা দেখাচ্ছে, তাই না? তা, কতই বা স্পষ্ট দেখবেন—ঝড়ের জন্যে সবকিছুই কেমন কেঁপে-কেঁপে যায়, তার ওপর কোনো জায়গা চিনে বার করতে হলে খুব নিপুণ চোখ চাই।'

'সত্যি এটা ডার্মস্টাট? আপনি ঠিক চিনছেন?'

'নিশ্চয়ই; আমার কোনো ভুল হয়নি। ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে এখন আমরা ছ-লিগ দূরে।'

'তাহ'লে তো আর দেরি করা ঠিক নয়—আমাদের এক্ষুনি নেমে পড়া উচিত।'

'নেমে পড়া! আপনি নিশ্চয়ই গির্জের চুড়োয় নামতে চান না,' লোকটা খুকখুক ক'রে হেসে উঠলো।

'গির্জের চূড়োয় নামতে চাই না বটে, কিন্তু শহরতলিতে নামতে তো আর বাধা নেই।'

'তা, আগে তো ওই চুড়োগুলোকে পেরিয়ে যাই।' ব'লেই সে আরো-কয়েকটা বালির বস্তা কাছে টেনে নিলে। যেই তাকে বাধা দিতে গেলুম, সে আমাকে এক হাতে ঠেলে সরিয়ে দিলো। বালির বস্তাগুলো প'ড়ে যেতেই বেলুন দু-হাজার গজ ওপরে উঠে গেলো।

সে শুধু বললে, 'অত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য ব্রিয়োশি, বিয়ো গে লুজা, বিকসিয়ো আর বারাল যে আরো ওপরে উঠে-ছিলেন, তা মনে রাখবেন।'

এবার একটু নরমভাবে বললুম, 'আমাদের কিন্তু নামতেই হবে। দেখছেন চারপাশে কেমন ঝড় ঘনিয়ে আসছে। যদি—'

তাচ্ছিল্যের স্বরে সে চেঁচিয়ে উঠলো, 'ঝড়ের ওপরে চ'লে গেলেই তো হয়। তাহ'লে তো আর ঝড়কে ভয় করতে হবে না। যে মেঘ মাটিকে চেপে আছে, তাকে অগ্রাহ্য করার চেয়ে মহত্তর আর কী আছে? আকাশে ঝড়ের

ঢেউ, তুলকলাম কাণ্ড—অথচ তার মধ্য দিয়ে আমরা পাড়ি দিয়ে চলেছি—এতেই তো গৌরব। মানুষ হিসেবে যাঁরা শ্রেষ্ঠ, তাঁরাই শুধু আমাদের মতো এমনিভাবে ভ্রমণ করেছেনে। ১৭৮৪ সালের ১৫ই জুলাই ফাবুরজ্-এর সাং-আঁতোয়ান থেকে এক বেলুন আকাশে উড়েছিলো, অজ্ঞাতের সন্ধানে—উড়েছিলেন চারজনে—মেঁ তালেম্বের আর পোহদবার কাউন্টেস মাদমোয়াজেল লা গারদ আর মারকি দ্য মে তালেম্বের—তাঁরা সবাই সেদিন যথেষ্ট দক্ষতা, নৈপুণ্য আর উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। লিয়ঁর লোরেসঁ আর দাম্পিয়ের-এর কাকন্দ্; নান্ৎ-এর মঁসির দ্য লুই: বরদোর দ্য'রবেল দ্য গ্রাঁজ; ইতালির শেভালীয় আন্দ্রেয়ানি; আর, এই কিছুদিন আগে ব্রুনস্বিকের ডিউক—প্রত্যেকেই আকাশে তাঁদের মহিমার স্বাক্ষর এঁকে গেছেন। আর তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই আমাদের যেতে হবে অন্তরিক্ষের একেবারে অগম্য প্রদেশে—তাঁদের সমান-সমান হ'তে হবে আমাদের, যেতেই হবে আরো উঁচুতে। নীলিমার অসীমের মধ্যেই আছে স্বর্গের আভাস—দেখবেন রক্তমাংস শুদ্ধু কেমন চনমন ক'রে উঠবে।'

হাওয়ার তনুভবনের দরুন বেলুনের উদ্যান খুব তাড়াতাড়ি প্রসারিত হচ্ছিলো। ইচ্ছে ক'রেই বেলুনের তলার দিকটা খালি রেখেছিলাম আমি। দেখতে পেলুম, সেই ফাঁকা অংশটুকু হালকা ও ছড়িয়ে-যাওয়া উদ্যানে এমন ফুলে ফেঁপে উঠেছে যে ভাল্‌ভটা খুলে দেয়া একান্ত জরুরি হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমার সেই রহস্যময় সহযাত্রী—তার রকমশকম দেখে বোঝা গেলো যে আমাকে সে বেলুনটা ইচ্ছেমতো চালাতে দেবে না। ঠিক করলুম তার চোখ এড়িয়েই ভাল্‌ভের দড়িটায় আমি টান দেবো। কে জানে কার পাল্লায় পড়েছি—কী-একটা খ্যাপা রহস্য যেন লোকটাকে ঘিরে আছে। এই আকাশে তার দিকে তাকিয়ে আবার আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠলো। কী যে ঘটবে কে জানে? কোন ভয়াবহ ক্ষিপ্র সান্ত্বনাহীন অধঃপতন আছে ভাগ্যে? পৌনে একটা বাজে এখন—ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে রওনা হয়েছি ৪০ মিনিট আগে। দক্ষিণের হাওয়ায় ভারি মেঘ ভেসে আসছে। যে-কোনো মুহূর্তে ঝড় ফেটে পড়বে বেলুনের চারপাশে।

'আপনার পরিকল্পনা কাজে খাটাবার আশা ছেড়ে দিয়েছেন নাকি?' আমার গলায় কৌতুহল আর উৎকণ্ঠা—দুইই ছিলো।

'আশা?' অচেনা লোকটার গলা হঠাৎ কেমন নিচু হ'য়ে এলো। লোকের ঠাট্টা-টিটকিরি আমাকে একেবারে ছিঁড়ে দিয়ে গেছে—এমন উজবুকের মতো

তাদের ব্যবহার যে আমার লোকের ওপর আর কোনো ভরশাই নেই। কিন্তু এই নির্যাতন ও নিগ্রহই তো আবিষ্কর্তাদের চিরন্তন ললাটলিখন! দেখুন না এই ক্যারিকেচারগুলো—নানা যুগের রঙ্গব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের চাক্ষুষ নিদর্শন—আমার এই ব্যাগ তো এ-সব কাগজ-পত্রেই ভরা।'

সহযাত্রীটি যখন তাড়া-তাড়া কাগজ নিয়ে শশব্যস্ত ও তন্ময়, আমি তখন আস্তে-আস্তে, তার অজান্তেই ভালভের দড়িটা চেপে ধরলুম। গ্যাস যখন বেরুতে থাকবে, তার হিশহিশ শব্দ তার কানে গিয়ে পৌঁছুবে নিশ্চয়ই—সে-ভয় তো আছেই—কিন্তু তবু একটা চেষ্টা…

'কত ঠাট্টাই তারা করেছিলো অ্যাবে মিয়োলেঁ-কে,' লোকটা বললে, 'ব্রেঁদা আর জানিন্-এর সঙ্গে আকাশে উড়েছিলেন তিনি। গ্যাস ভরবার সময় কেমন ক'রে যেন আগুন ধ'রে যায় বেলুনে—অন্ধ নির্বোধগুলো বেলুনটাকে টুকরো-টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেললো। তারপরেই বেরিয়েছিলো এই ক্যারিকেচার—"অদ্ভুত জন্তু" নামে এই টিটকিরি-ভরা ছবি প্রত্যেকের নাম নিয়ে শ্লেষ ক'রে নতুন একেকটি নাম দিয়েছিলো তারা তখন!'

আস্তে ভাল্‌ভের দড়ি ধ'রে টান দিলুম, আর তক্ষুনি তাপমান যন্ত্রের উত্থান শুরু হ'লো। কাজটা হ'লো একেবারে ঠিক সময়ে—কারণ ততক্ষণে দক্ষিণ দিকে দূরে মেঘের ডাক শুরু হ'য়ে গেছে।

'এই দেখুন আরেকটা ছবি,' আমি যে কী করছি, সে-সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ না-ক'রে লোকটা আবার শুরু করলো, 'দেখুন এই ছবিটা—মস্ত একটা বেলুন, তাতে আস্তে-আস্তে জাহাজ আর বড়ো-বড়ো দুর্গ বসানো—বেলুনটা সব ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই ব্যঙ্গচিত্রের শিল্পী এটা জানে না যে তার এই নির্বোধ তুলির আঁচড়ই একদিন সত্যি হ'য়ে উঠবে। সব কিছু আছে এই বিরাট বিমানে—বাঁ দিকে হালের কাছে আছে সারেঙের আসন, সামনের দিকটায় আছে প্রমোদভবন—আছে মস্ত একটা অর্গান—আর ভূমণ্ডল কিংবা চাঁদের বাসিন্দাদের ভয় দেখাবার জন্য বিরাট একটা কামান! পেছনের পাটাতনের ওপরে বসানো আস্ত একটা মানমন্দির—তাছাড়া বেলুনের গাধাবোটও রয়েছে ওখানে—নিরক্ষীয় বৃত্তের কাছে আছে সৈন্যশিবির, তার বামদিকে ধূমনল; ওপরতলায় আছে প্রমোদবিতান, বেলুনের পাল আর মস্ত ডানা; তার নিচে কফিখানা, রেস্তোরাঁ আর ভাঁড়ার ঘর। আর নিচে রয়েছে এই অজ্ঞ ও নির্বোধ ঢক্কানাদ :

"মানবজাতির সুখের জন্য আবিষ্কৃত এই মণ্ডলাকার বিমানটি অবিলম্বে

ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরের বন্দরগুলির উদ্দেশে যাত্রা করিবে ; কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা, সেখান হইতে ফিরিবার পর বিমানটিকে তাঁহারা দুই মেরু ও পৃথিবীর পশ্চিমবিন্দুর উদ্দেশে প্রেরণ করিবেন ; যাত্রিগণ এক বস্ত্রে আসিয়া এই আকাশযানে উঠিতে পারেন—কাহাকেও সঙ্গে কিছু লইতে হইবে না। সবদিকেই কর্তৃপক্ষের পুরা খেয়াল রহিয়াছে, এতদ্ব্যতীত দিনে-দিনে ব্যবস্থা আরো ভালো বৈ মন্দ হইবে না। সকল গন্তব্যস্থলের যাত্রীমাশুলই সামঞ্জস্য রাখিয়া স্থিরীকৃত হইবে—তবে আমাদের গোলার্ধের দূরতম দেশগুলির ভাড়া সর্বদাই এক থাকিবে—অর্থাৎ দুই মেরু বা পশ্চিমপ্রান্তের উদ্দেশে যাইতে হইলে একই মাশুল লাগিবে—অর্থাৎ মাত্র সহস্র লুই। স্বীকার্য, বেলুনের বেগ, সুব্যবস্থা ও আরামপ্রদ পরিবেশের কথা চিন্তা করিলে এই বেলুনে যাত্রীদের জন্য যে-ধরনের ব্যবস্থা রহিয়াছে, তেমনটি কোথাও মিলিবে না ; প্রত্যেকের রুচি ও অভ্যাসের দিকে লক্ষ রাখা হইয়াছে। কেহ ইচ্ছা করিলে সারাক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিতে পারেন, আবার কেহ বা পায়ের পাতায় ভর করিয়া লাট্টুর মতো অবিরাম ঘুরিয়া নৃত্য করিতে পারেন। উদররসিকদের জন্য যেমন নানাবিধ মূল্যবান ও মুখরোচক খাদ্যের ব্যবস্থা আছে, তেমনি কেহ যদি অনশনপ্রিয় হন তবে তাহাকে যাতে কোনো বাবুর্চি বা খানশামাই, জ্বালাতন না-করে, সেদিকেও নজর আছে। যাঁহারা অতি চালাকদের সঙ্গ পছন্দ করেন তাঁহাদের জন্য মনের মতো সঙ্গী যেমন সেখানে পাওয়া যাইবে, তেমনি যাঁহারা হাবাগোবা জড়বুদ্ধি মানুষের সঙ্গপ্রিয়, তাঁহারাও মনঃপূত সহযাত্রী পাইবেন। এই বিমান কম্পানির মূলমন্ত্রই হইল প্রমোদ বিতরণ—এই কথাটি সবিশেষ স্মরণীয়।"

'ভাবুন, এই পচা রসিকতাতেও লোকে হেসেছিলো। কিন্তু হঠাৎ একদিন যদি টপ ক'রে ম'রে না যাই, তাহ'লে একদিন এরা দেখতে পাবে যে এদের সব পরিহাসই সত্যে পরিণত হয়েছে।'

বেলুন যে তখন নিচে নামছে, সে দিকে কোনো দৃক্‌পাত না ক'রে সে তার দামি সংগ্রহটিকে আমার সামনে বিছিয়ে দিলে। 'এই হাসিঠাট্টার মধ্যেই কিন্তু বিমানশিল্পের পুরো ইতিহাস লুকোনো আছে। অনেক অভিজাত ব্যক্তি পর্যন্ত এই হালকা ও মাথামোটা খেলায় মেতেছিলেন। কতগুলো খেলা হয়েছে এ নিয়ে—কোন বেলুন কদ্দুর যাবে তা নিয়ে বাজি ধরা হ'তো—আর বেলুনবাজ লোকটা শেষ অব্দি কোথায় পৌঁছুতো তার উপর বাজির হার-জিৎ নির্ভর করতো।'

'আপনি দেখছি বিমানবিদ্যা নিয়ে বিস্তর পড়াশুনা করেছেন।'

'করেছিই তো। ফীথন, ইকারুস, আরথিতাস—কিংবদন্তির এই নায়কদের থেকে শুরু ক'রে এ পর্যন্ত যত আকাশযাত্রার চেষ্টা হয়েছে, সব আমি গভীর-ভাবে অধ্যয়ন করেছি। ভগবান যদি আমাকে পরমায়ু দিতেন, তা'হলে বিমানবিদ্যায় আমি অজস্র জিনিশ দিতে পারতুম। কিন্তু তা তো আর হবার নয়।'

'কেন?'

'কারণ আমার নাম হ'লো এম্পেদকলেস বা এরোস্ত্রতুস্।'

বেলুন এই ফাঁকে আস্তে-আস্তে মাটিতে নেমে আসছিলো। কিন্তু লোকে যখন শূন্য থেকে ঘুরপাক দিয়ে পড়ে, তখন একশো ফিট উচ্চতায় যা পরিণাম, পাঁচ হাজার ফিটেরও তাই।

'আপনার মনে আছে ফ্লোরাল যুদ্ধের কথা?' লোকটার মুখ কেমন উত্তেজিত ও আরক্তিম দেখাচ্ছিলো। 'সেই যুদ্ধেই সরকারের আদেশে কোঁতেলো একটি বেলুনবাহিনী করেছিলেন। মার্বেজ দখলের সময় পর্যবেক্ষণ ও সংবাদসংগ্রহের এই নতুন অবলম্বনটি থেকে জেনারেল জুঁর্দা এত উপকার পেয়েছিলেন যে কোঁতেলোর সঙ্গে দিনে দু-বার ক'রে তিনি নিজেই বেলুনে উঠতেন। বৈজ্ঞানিক ও তাঁর অনুচরদের মধ্যে সংকেত সংবাদের বিনিময় হ'তো। সংকেত করা হ'তো নিশেন নেড়ে—নিশেন ছিলো তিন রঙের—শাদা, লাল আর হলদে। মাঝে-মাঝে বেলুন লক্ষ্য ক'রে শত্রুপক্ষের বন্দুক ও কামান গর্জে উঠতো, কিন্তু বেলুনের গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত পড়তো না। জেনারেল জুঁর্দা যখন শারলেরো আক্রমণের জন্য তৈরি হচ্ছিলেন, তখন কোঁতেলো বেলুনে চেপে সেখানে গিয়েছিলেন। জেনারেল মোরলোর সঙ্গে সাত-আট ঘণ্টা ধ'রে চারপাশে অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন তিনি। ফ্লোরার যুদ্ধ জয় করার পিছনে তাঁর অবদান কতখানি, সেটা এবার ভেবে দেখুন। জেনারেল জুঁর্দা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে বৈমানিক বাহিনীর পর্যবেক্ষণ ও তথ্যসংগ্রহ তাঁকে বহুভাবে সাহায্য করেছিলো। কিন্তু সেই যুদ্ধে ও পরে বেলজিয়াম অভিযানের সময়, বেলুনবাহিনীর সাহায্যে অনেক দিক থেকে উপকৃত হওয়া সত্ত্বেও, বেলুনকে কিন্তু আর-কখনও সামরিক কাজে লাগানো হয়নি; মিশর থেকে ফিরেই বোনাপার্ত ম্যাঁদার সরকারি প্রতিষ্ঠানটিকে তুলে দেন। ফ্রাঙ্কলিনের কথা তুলে বলা যায়, এই নবজাতকের কাছ থেকে সত্যি কতটুকু আশা করতে পারেন আপনি? শিশুটি জন্মেছিলো প্রাণবন্ত ও সতেজ—কিন্তু তাকে গলা টিপে মেরে ফেলা হ'লো!'

দুই হাতের মধ্যে, মুখ ঢেকে সে ব'সে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর হঠাৎ মাথা তুলে ব'লে উঠলো, 'আমার নিষেধ সত্ত্বেও আপনি ভাল্ভ খুলেছেন!'

তক্ষুনি আমি দড়িটা থেকে হাত সরিয়ে নিলুম।

'ভাগ্যিশ বালির বস্তায় এখনও তিনশো পাউণ্ড ভার আছে!'

'তার মানে? আপনার মৎলব কী, বলুন তো?'

সে জিগেশ করলে, 'কখনো সমুদ্রপাড়ি দিয়েছেন?'

স্পষ্ট বুঝতে পারছিলুম আমার মুখটা ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছে।

সে ব'লে চললো, 'আমাদের বেলুন অ্যাড্রিয়াটিকের দিকে ভেসে যাচ্ছে। তা অ্যাড্রিয়াটিক তো মাত্র ছোট্ট একটা স্রোত—আরো দূরে গেলে অন্য অনেক স্রোত পাওয়া যাবে।' ব'লে সে চট ক'রে কয়েক বস্তা বালি ছুঁড়ে ফেলে দিলে। তারপর জানালে, 'ভেবেছিলেন যে আপনার কাজ লক্ষ করিনি? উঁহু। বেলুনের গ্যাস প্রসারিত হ'য়ে হঠাৎ ফেটে যেতে পারতো ব'লেই আপনাকে তখন ভাল্ভটা খুলতে দিয়েছিলুম; কিন্তু খবরদার, আর-কখনও এরকম করবেন না।'

তারপর আবার তার কাহিনী শুরু হ'লো;

'ব্লাঁশার আর জেফ্রি কেমন ক'রে ডোভার ক্যালে গিয়েছিলেন, জানেন? ১৭৮৫ সালের ৭ই জানুয়ারি হাওয়া বইছিলো উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে। তাঁরা পরিকল্পনামতো ডোভারের উপকূলে বেলুনে গ্যাস ভরলেন। হিশেবে গণ্ডগোল হয়েছিলো, ভারসাম্য বজায় ছিলো না, কাজেই বেলুনে ওঠবার সঙ্গে-সঙ্গেই সবগুলো বালির বস্তা তাঁদের ফেলে দিতে হয়েছিলো—শুধু শেষ সম্বল হিসেবে সঙ্গে রেখেছিলেন মাত্র ত্রিশ পাউণ্ড ওজন। কিন্তু ত্রিশ পাউণ্ড আর কতটুকু। হাওয়ার বেগ ছিলো যেমনকে তেমন, ফলে বেলুন ফরাশি উপকূলের দিকে এগুচ্ছিলো উড়ো শামুকের মতো আস্তে। তাছাড়া কলায় (টিস্যু) মধ্যে ছিলো সূক্ষ্ম ছিদ্র, ফলে একটু একটু ক'রে গ্যাস বেরিয়ে যাচ্ছিলো। দেড় ঘণ্টার মধ্যেই বৈমানিকেরা আবিষ্কার করলেন যে তাঁরা নিচে নেমে যাচ্ছেন।

'জেফ্রি জিগেশ করলেন, "এবার কী করবে, ব্লাঁশার?" ব্লাঁশার বললেন "মাত্র তো সিকিপথ এসেছে এতক্ষণে—তাও নিচু দিয়ে। অথচ ওপরে উঠলে বোধহয় অনুকূল হাওয়া পাওয়া যেতো।"

"বাকি ত্রিশ পাউণ্ড না হয় এবার ফেলে দিই।"

'বেলুন একটু হালকা হ'য়ে সাময়িকভাবে ওপরে উঠলো বটে কিন্তু একটু

পরেই আবার নিচে নেমে এলো। আদ্ধেক পথ এসে তাঁরা সব যন্ত্রপাতি ও পুঁজিপত্র ফেলে দিলেন। মিনিট পনেরো পরে ব্ল্যাঁশার জিগেশ করলেন, "তাপমান যন্ত্র কী বলে ?"

"পারদ ক্রমশ উঠে যাচ্ছে। আর আমাদের রক্ষে নেই—অথচ ফ্রান্সের উপকূল কিন্তু চোখে পড়ছে এখন !"

'হঠাৎ জোরে একটা আওয়াজ হ'লো। জেফ্রি জিগেশ করলেন, "কী হ'লো ? বেলুন ফেটে গেলো নাকি ?"

"না, গ্যাস ক'মে গিয়ে বেলুনের তলার দিকটা একেবারে চুপশে গিয়েছে। আমরা কিন্তু এখনও নেমে যাচ্ছি। না, আর আমাদের রেহাই নেই। এক্ষুনি বাকি সব জিনিশ ফেলে দাও !"

'দাঁড়, হাল, রশদপত্ত—সব ফেলে দেয়া হ'লো। বেলুনটা তখন সমুদ্র থেকে মাত্র একশো গজ ওপরে।

"আবার তা'হলে ওপরে উঠছি !"

"না। আচমকা ভার ক'মে যেতে একটু যা উঠলো। এদিকে তো একটাও জাহাজ চোখে পড়ছে না—দিগন্ত অবধি শুধু ধু-ধু নীল জল—একটা ভেলা অব্দি নেই। পোশাক-আশাকও খুলে ফেলি, এসো।"

'প্রায় নগ্ন হ'য়ে গেলেন তাঁরা ; বেলুন কিন্তু তখনও কেবল নামছে।

'জেফ্রি বললেন, "ব্ল্যাঁশার, একাই তো অভিযানে বেরুতে যাচ্ছিলে তুমি—কেবল অনুরোধ এড়াতে না-পেরে আমায় সঙ্গে নিয়েছো। আমি বরং জলে ঝাঁপিয়ে পড়ি—তাহ'লে অনেকটা ভার ক'মে যাবে, বেলুনও আবার ওপরে উঠে যাবে।"

"না, জেফ্রি, না। তা হয় না !"

'বেলুনের গ্যাস তখন ফুরিয়ে আসছে। চুপশে গিয়ে অবতল বেড়ে গিয়েছে দ্বিগুণ, গ্যাসকে আরো চাপ দিচ্ছে—আর তার ফলে বেলুন তখন হুড়মুড় ক'রে নিচে নামছে।

"বিদায়, ব্ল্যাঁশার বিদায়" ডক্টর জেফ্রি বললেন, "ভগবান তোমায় রক্ষা করুন।"

'জেফ্রি তক্ষুনি জলে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, 'কিন্তু ব্ল্যাঁশার তাকে আটকে ফেললেন।

'তখন জেফ্রির মাথায় আরেকটা বুদ্ধি খেললো। "ব্ল্যাঁশার, আরেক উপায় আছে। দোলনাটা কেটে ফেলে দিয়ে আমরা জাল ধ'রে ঝুলে থাকতে পারি—

হয়তো তাতে একটু ওপরে ওঠা যাবে। ভালো ক'রে জালটা আঁকড়ে ধরো ; তৈরি তো ? কিন্তু—আরে—তাপমান যন্ত্রে তো পারদ নেমে যাচ্ছে। নতুন হাওয়া এলো তাহ'লে। বেঁচে গেলাম, ব্ল্যাশার, আমরা বেঁচে গেলাম।"

'কাছেই ক্যালে দেখা গেলো। হর্ষে উল্লাসে তাঁরা তখন ক্ষিপ্তপ্রায়, একটু পরেই তাঁরা গুইয়ে'র জঙ্গলে এসে পড়লেন। আমি বলছি আপনাকে, ও-অবস্থায় পড়লে আপনিও ডক্টর জেফ্রির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতেন।'

বেলুনের তলায় তখন ঝকঝকে ভরের মতো মেঘের ভাঁজ খুলে গেছে—অতিকায় হ'য়ে তার ওপর সচল ছায়া পড়েছে বেলুনের—গোল উজ্জ্বল সোনার ছাতার মতো মেঘ ঘিরে আছে বেলুনকে। দোলনার ঠিক নিচেই গুমগুম ক'রে ডেকে উঠছে বাজ। আতঙ্কে আমার রক্ত হিম হ'য়ে এলো। চেঁচিয়ে উঠলুম, 'এবারে নামতেই হবে আমাদের, এক্ষুনি—'

'ওপরে সূর্য আমাদের জন্য অপেক্ষা ক'রে আছে, আর এখন আমরা নিচে নেমে যাবো ! বরং আরো কতগুলো বস্তা ফেলে দেয়া যাক !'

বেলুন থেকে আরো পঞ্চাশ পাউণ্ড ভার ক'মে গেলো। ততক্ষণে সাড়ে-তিন হাজার গজ ওপরে উঠে এসেছে বেলুন। অচেনা লোকটা একটানা ব'কে যাচ্ছে। আমার মাথার মধ্যে রক্তের নাচ ! কেমন অবসন্ন লাগছে, কেমন নিস্তেজ—তার কিন্তু ফুর্তির সীমা নেই।

'সুবাতাসে অনেক দূর চ'লে যাওয়া যাবে, হাসতে-হাসতে বললে সে, 'অ্যান্টিলেসে হাওয়ার স্রোত এমন যে ঘণ্টায় একশো মাইলেরও বেশি যাওয়া যাবে। নাপোলিয়ঁর অভিষেকের সময় গার্নের' রাত এগারোটার সময় রঙিন লণ্ঠনজ্বলা বেলুন উড়িয়ে দিয়েছিলেন—বাতাস বইছিলো বায়ুকোণ থেকে। পরদিন ভোরবেলায় রোমার মানুষ ঋষি পিতরের স্তম্ভের পাশ দিয়ে তাকে চ'লে যেতে দেখেছিলো। আমরা কিন্তু আরো দূরে উড়ে যাবো—আরো উঁচুতে, সূর্যের কাছাকাছি !'

আমার কানে তখন সব কথা পৌঁছুচ্ছে না—কেমন ঝিমঝিম করছে গা-হাত-পা, যেন চারপাশে সব বনবন ক'রে ঘুরছে। মেঘের মধ্যে একটা ফাটল বেরিয়ে এলো।

'ঐ দেখুন স্পায়ার নগরী।' চেঁচিয়ে বললে সেই অচেনা।

দোলনা থেকে তাকিয়ে দেখি ছোট্ট একটা কালো রেখা। সত্যি স্পায়ার ; তাতে আর সন্দেহ নেই। মস্ত রাইন নদীকে দেখাচ্ছে সরু ফিতের মতো। মাথার ওপরে আকাশ এখন ঘন নীল ; পাখিরা পর্যন্ত অনেক আগেই আমাদের

সঙ্গ ত্যাগ করেছে—ও রকম হালকা হাওয়ায় ওড়বার ক্ষমতা তাদেরও নেই। এই নীল নিঃসীম শূন্যে আমরা দুজনেই শুধু জীবন্ত প্রাণী—আমি আর সেই রহস্যময় অচেনা ক্ষ্যাপা লোকটা।

'আপনাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি, তা জেনে আর কী লাভ?' মেঘের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলে সে দিগ্‌দর্শিকা। 'আঃ! অধঃপাতের চেয়ে সুন্দর আর কী আছে! পিয়েতর দ্য রসিয়ে থেকে শুরু ক'রে লিউটেনান্ট গেল পর্যন্ত বেলুনবিদ্যার ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাবেন, সব দুর্ঘটনারই কারণ হঠকারিতা—শুধু অপরিণামদর্শীরাই চিরকাল বিপদে পড়ে। ১৭৮৫-র ১৩ই জুন বোলোন-এর রোমঁ্যা থেকে বেলুনে রওনা হয়েছিলেন দ্য রসিয়ে। নিজের বেলুনের সঙ্গে তিনি জুড়ে দিয়েছিলেন মোঁৎগোলফিয়ের-এর উষ্ণ বাতাস সৃষ্টির যন্ত্র—যাতে গ্যাস না কমিয়ে বা বালির বস্তা না-ফেলে ওঠা নামা করা যায়। এ যেন বারুদের স্তূপে জলন্ত মশাল ফেলে দেয়া। চারশো গজ ওঠবার পর আবার প্রতিকূল হাওয়ার পাল্লায় পড়লেন তারা—সেই হাওয়া তাঁদের তাড়িয়ে নিয়ে এলো বারদরিয়ায়। বেগতিক দেখে নেমে পড়তে চাচ্ছিলেন পিয়েতর, চেষ্টা করছিলেন ভাল্‌ভটা খোলবার, কিন্তু ভাল্‌ভের দড়িটা এমনিভাবে বেলুনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলো টানাটানি করতে গিয়ে ছিঁড়ে গেলো—আর ভুউশ ক'রে বেলুন থেকে সব গ্যাস বেরিয়ে চোপশানো বেলুনটা ধপ ক'রে পড়লো মোঁৎগোলফিয়ের-এর ঐ যন্ত্রের ওপর, উল্টে ফেললো তাকে—আর সেই দুর্ভাগাদের নিচে টেনে নিয়ে এলো! অত ওপর থেকে প'ড়ে তাঁরা একেবারে চুরমার হ'য়ে গেলেন। ভয়ংকর, তাই না?'

আমি শুধু বললুম, 'ভগবানের দোহাই, নিচে নামতে দিন।'

আমাদের চারপাশে মেঘ, নিচে বারবার গম্ভীর-ভীষণ বাজের আওয়াজ, আর বেলুনের গহ্বরে তারই একটা প্রতিধ্বনি।

'আপনিই কিন্তু খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে বাধ্য করলেন,' লোকটা চেঁচিয়ে বললে, 'বেশ। উঠছি, না নামছি—আর তা আপনি জানতে পারবেন না।'

দিগ্‌দর্শিকার পথেই তাপমানযন্ত্রটি নেমে গেলো, সঙ্গে নিয়ে গেলো আরো ক-টা বালির বস্তা। উঠে এসেছি পাঁচ হাজার গজ তো হবেই। এর মধ্যেই দোলনার গায়ে বরফঝুরি জমছে; আমার অস্থিমজ্জায় যেন হিমানীর স্রোত খেলে যাচ্ছে। নিচে ভয়ঙ্কর ঝড় ফেটে পড়ছে ততক্ষণে—ওপরে আছি ব'লে আমরা অবশ্যি তার পাল্লায় পড়লুম না।

'এত ভয় পাচ্ছেন কেন', আমাকে আশ্বাস দিলে অচেনা, 'শুধু যারা

অপরিণামদর্শী, বিবেচনাহীন, উদ্ধত—তারাই সবসময় মারা পড়ে। অর্লিয়ঁ‍াতে যিনি ধ্বংস হয়ে যান, সেই অলিভারি উঠেছিলেন কাগজের তৈরি মোঁৎগোল-ফিয়ের-এ, হাওয়া গরম করার চুল্লির তলায় ছিলো তাঁর দোলনা, আর বস্তার মধ্যে যে-ভার ছিলো তার ছিলো দাহগুণ—হঠাৎ আগুন ধ'রে গেলো—অধঃপতন হ'লো অলিভারির, মরলেন!···হালকা চ্যাপ্টা একটা থালার মতো দোলনায় ক'রে মোজসেঁ। উঠেছিলেন লিই-এ ; হঠাৎ দোল খেলো তাঁর বেলুন, ভারসাম্য হারিয়ে উলটে গেলো,—হ'লো অধঃপাত, মরলেন। মানহাইম-এ বিটোরক দেখলেন তাঁর বেলুনে আগুন ধ'রে গেছে—হ'লো অধঃপাত, তিনিও মরলেন! হ্যারিস উঠেছিলেন বাজে একটা বেলুনে—ভাল্‌ভটা ছিলো মস্ত, সহজে বন্ধ হ'তে চাইতো না। হ'লো অধঃপাত, হ্যারিস মরলেন।···হাওয়ায় ভেসে থাকবার জন্য আগেই এক সময় বালির বস্তাগুলো ফেলে দিয়েছিলেন অ্যাডলার ; হাওয়া তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে এলো বস্টন-এ ; ধাক্কা লাগলো চিমনিতে—ফলে শূন্য থেকে পতন ও মৃত্যু। ককিং নামছিলেন উত্তাল এক প্যারাস্যুটে, ভেবেছিলেন প্যারাস্যুটটি বুঝি নিখুঁত তৈরি ; হ'লো শূন্য থেকে পতন—এবং মৃত্যু···তবু, তবু আমি এঁদের ভালোবাসি। নিজেদেরই হঠকারিতার বলি এরা—কিন্তু কেউই এঁরা স্বার্থবশ নন : এঁরা আত্মাহুতি দিয়েছেন সমগ্র মানব জাতির জন্য। আমিও এঁদেরই মতো মরতে চাই। তাই আরো উঁচুতে উঠতে হবে আমাদের—আরো ওপরে।'

আমার চোখের সামনে তখন মৃত্যুর ছায়াবাজি খেলে যাচ্ছে। তনূ-ভবনের ফলে বাতাস হ'য়ে আছে হালকা, রোদ পড়েছে সরাসরি—ফলে বেলুনের মধ্যে গ্যাস কেবলই অপসারিত হচ্ছে, আর বেলুন কেবল উঠছে তো উঠছেই। কলের পুতুলের মতো হাত চ'লে গেলো আমার, চেষ্টা করলুম ভাল্‌ভটা খুলে দিতে—কিন্তু পাগল নাকি লোকটা, সত্যি মাথাখারাপ?—সে চট ক'রে ভাল্‌ভের দড়িটা আমার মাথার ওপরে কেটে দিলে—যাতে সহজে কিছুতেই দড়িটা আমি নাগালে না-পাই!

'মাদাম ব্লাঁশারকে প'ড়ে মরতে দেখেছিলেন আপনি?' লোকটার গলার স্বর কেমন একঘেয়ে, নেশাধরানো, ঝিমঝিমে। 'আমি দেখেছি—হ্যাঁ, নিজের চোখে দেখেছি। ১৮১৯ সালের ৬ই জুলাই আমি ছিলুম টিভোলিতে। গ্যাস ভরার খরচ কমাবার জন্য ছোট্ট একটা বেলুনে উঠেছিলেন মাদাম ব্লাঁশার, আর ছোটো ব'লেই বেলুনটার খোল ভর্তি ক'রে গ্যাস ভরতে হয়েছিলো। তলার দিক থেকে হঠাৎ কেন যেন গ্যাস বেরিয়ে যেতে লাগলো—কোথাও

কোনো ছ্যাদা হ'য়ে গিয়ে থাকবে—যেন ধোঁয়ার পুচ্ছের মতো উদ্‌যান বেরিয়ে যাচ্ছে। আতশবাজির ধরনে একটা আলোকবেষ্টনী নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি—তার দিয়ে সেটা দোলনার সঙ্গে আটকানো—ঠিক ছিলো, আকাশে উঠে সেটা তিনি জ্বালিয়ে দেবেন। আগেও এ-কাজ করছেন তিনি অনেকবার। সেদিন আবার সঙ্গে ছিলো ছোটো একটা প্যারাস্যুটও—হাউয়ের একটা প্যারাস্যুট—না কি তুবড়ির? অর্থাৎ ঠিক ছিলো সেই জ্বলন্ত প্যারাস্যুট রুপোলি আগুনের বৃষ্টির মতো আস্তে-আস্তে ঝ'রে পড়বে। দোলনায় সেজন্য আগুনও জ্বালানো হয়েছিলো—ঠিক ছিলো আকাশে উঠেই ঐ প্যারাস্যুটকে তিনি আগুন ধরিয়ে দেবেন—অমনি আকাশ থেকে রুপোর ঝরনা নেমে আসবে। বেলুনে চেপে উঠলেন তিনি ওপরে; রাত্রি ছিলো মেঘলা ও কুয়াশাভরা। আতশবাজিটায় আগুন ধরাবার সময় খেয়াল না-ক'রে অবিবেচকের মতো জ্বলন্ত মোমবাতিটা তিনি উদ্‌যানের সেই অনর্গল স্রোতের তলায় নিয়ে গিয়েছিলেন। এক দৃষ্টে তাকিয়েছিলুম আমি তাঁর দিকে। হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত একটা আলো ঝলশে উঠলো; প্রথমটায় ভেবেছিলুম, বুঝি নতুন কোনো তাক-লাগানো খেলা। ঝলশে উঠলো আলো, দপ ক'রে নিভে গেলো একবার, পরক্ষণেই জ্ব'লে উঠলো আবার—বেলুনটাকে দেখে মনে হ'লো যেন জ্বলন্ত গ্যাসের এক উড়ন্ত ভেলা। ভয়ংকর সেই আলো, গোটা বুলভার, গোটা মোঁমার্ৎর্‌ আলো হ'য়ে গেলো, দিনের মতো ঝলমলে। দুর্ভাগিনী উঠে দাঁড়িয়ে কোনো রকমে দু-দু-বার চেষ্টা করলেন বেলুনের উপাঙ্গ বন্ধ ক'রে দেবার—যাতে আগুন নিভে যায়। পারলেন না। ধপ ক'রে ব'সে পড়লেন বেলুনের দোলনায়, বেলুনটাকে নামিয়ে ফেলতে চাইলেন নিচে--তখনও বেলুনটা নিচে পড়তে শুরু করেনি। কয়েক মিনিট মাত্র, গ্যাস জ্বলছে, আগুনের পুচ্ছ বেরিয়ে এসেছে বেলুন থেকে—তারপর বেলুনটা আস্তে-আস্তে ছোটো হ'য়ে এলো, এবার বেলুনটা অতি মন্থরভাবে নিচে নামতে লাগলো—শূন্য থেকে পতন বলতে যা বোঝায়, ঠিক তা নয়। বায়ুকোণ থেকে হাওয়ার ঝাপটায় বেলুনটা পারীর দিকে এগিয়ে গেলো। এখন যেখানে রু স্ত প্রভঁস বাড়িটা, তখন সেখানটায় ছিলো মস্ত কতগুলো বাগান। মাদাম ব্লাঁশার সেখানেই নামবার চেষ্টা করলেন, কারণ তাহ'লে ততটা ভয়ের কিছু হবে না। কিন্তু বেলুন আর দোলনা হঠাৎ একটা বাড়ির ছাতে গিয়ে ধাক্কা খেলো। "বাঁচাও! বাঁচাও!" আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন হতভাগিনী। আমি দৌড়ে আসছিলুম পেছন-পেছন; দেখলুম, বেলুনের দোলনা ছাতে ধাক্কা খেয়ে একটা লোহার ডাণ্ডার

গায়ে এসে পড়লো। আর ধাক্কার চোটে মাদাম ব্লাশার দোলনা থেকে ছিটকে বেরিয়ে শূন্যে তিনবার পাক খেয়ে রাস্তায় এসে পড়লেন। পরে তাঁর চুরমার মৃতদেহটাই শুধু পাওয়া গিয়েছিলো।'

গল্পগুলো শুনছি, আর আমার গা-হাত-পা অসাড় হিম হ'য়ে আসছে। অচেনা লোকটা তখন দোলনায় দাঁড়িয়ে ; উদ্‌ভ্রান্ত অপ্রকৃতিস্থ তার মুখ-চোখ ; মাথায় কোনো টুপি নেই—রুক্ষ অবিন্যস্ত উশকোখুশকো চুল, চোখ দুটি অস্বাভাবিকভাবে জ্বলছে। না, আর কোনো সংশয় নেই।

ভয়ংকর সত্যটা হঠাৎ যেন ঝলসে উঠলো : উন্মাদ! হ্যাঁ, আস্ত এক উন্মাদের পাল্লায় পড়েছি আমি।

বাকি বালির বস্তাগুলিকে সে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। অন্তত না-হাজার গজ ওপরে উঠে এসেছে তখন বেলুন। নইলে হঠাৎ আমার নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বেরুবে কেন?

'বিজ্ঞানের শহিদরাই সবচেয়ে মহৎ,' সেই উন্মাদ বিকৃত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো, 'চিরকাল এই শহিদদের পূজো করে মানুষ···কখনও তাদের কেউ ভোলে না।'

তার সব কথা কিন্তু আমার কানে ঢুকছে না। কেমন বিমূঢ়, আর বড্ড অসহায় বোধ করছি আমি। এই নিঃসীম শূন্যে এক সর্বনেশে পাগলের সঙ্গে একা দাঁড়িয়ে আছি বেলুনের দোলনায়, তাকিয়ে আছি তার ঘোলাটে জ্বলন্ত চোখ দুটোর দিকে। আমার কানের কাছে মুখ এনে বিড়বিড় ক'রে সে বলছে—কী বলছে?

'জাম্বেকারির সেই দুর্বিপাকের কথা আপনার মনে আছে? ১৮০৪ সালের ৭ই অক্টোবর কয়েকদিন অবিরাম ঝোড়ো হাওয়া আর বৃষ্টির পর মেঘ যেন একটু স'রে গিয়েছিলো। কিন্তু কিছুতেই জাম্বেকারির আকাশভ্রমণকে ঠেকিয়ে রাখা গেলো না। আগেভাগেই ভ্রমণের দিন ঘোষণা করা হয়েছিলো, তাঁর শত্রুরা নানাভাবে উত্ত্যক্ত করতে লাগলো সুযোগ পেয়ে, ঠাট্টা-টিটকিরির বন্যা ব'য়ে গেলো—তাই নিজেকে আর বিজ্ঞানকে লোকের হাসিঠাট্টার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে আকাশে ওঠা খুবই জরুরি হ'য়ে উঠলো তাঁর কাছে। তাঁকে উঠতে হবে বোলোন থেকে : বেলুন গ্যাস ভরার সময় কেউ তাঁকে একফোঁটা সাহায্য করলো না। নিজেই সব কাজ করলেন জাম্বেকারি, তারপর মধ্যরাত্রে উঠলেন আকাশে, সঙ্গে ছিলো আন্দ্রেওলি আর গ্রোসেত্তি। আস্তে-আস্তে ওপরে উঠতে লাগলো বেলুন—বৃষ্টির ফোঁটা প'ড়ে বেলুনের খোলে

কোথাও নিশ্চয়ই সূক্ষ্ম ছিদ্র হ'য়ে গিয়েছিলো, গ্যাস বেরিয়ে যাচ্ছিলো, আর তাই যতটা ভাবা গিয়েছিলো ততটা জোরে বেলুন উঠতে পারছিলো না। নির্ভীক বৈমানিক তিনজন কোলঢাকা লণ্ঠনের আলোয় তাপমানযন্ত্রের ওঠা-নামাটাই কেবল দেখতে পারছিলেন। গত চব্বিশ ঘণ্টায় জাম্বেকারি খাবার ফুরসৎ পাননি, গ্রোসেত্তির দশাও অনশনক্লিষ্ট।

"ঠাণ্ডায় আর অবসাদে আমি একেবারে বিধ্বস্ত", জাম্বেকারি বন্ধুদের জানালেন, "বোধহয় ম'রেই যাচ্ছি।"

'মূর্ছিত হ'য়ে প'ড়ে গেলেন তিনি দোলনায়। একটু পরে গ্রোসেত্তিও সংজ্ঞা হারালেন! শুধু আন্দ্রেওলি রইলেন সচেতন। অনেক শুশ্রূষা ক'রে তিনি জাম্বেকারির জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন।

' "কী? খবর কী? কোনদিকে যাচ্ছি আমরা? বাতাস কী রকম আছে? ক-টা বাজে এখন?"

"দুটো বাজে।"

"দিগ্‌দর্শিকা কোথায়?"

"বিকল হ'য়ে গেছে!"

"কী সর্বনাশ! লণ্ঠনও তো নিভে গেছে দেখছি!"

'এত হালকা হাওয়ায় যে লণ্ঠন জ্বলতে পারে না, জাম্বেকারি তা জানতেন। আকাশে চাঁদ নেই। কী-রকম এক স্যাঁতসেঁতে ভেজা অন্ধকারে আবহমণ্ডল ডুবে আছে।

' "আন্দ্রেওলি, বড্ড শীত করছে আমার। একেবারে জ'মে যাচ্ছি। কী করি, বলো তো।"

'আস্তে-আস্তে তাঁরা শাদাআভাওলা ঝোড়ো মেঘের স্তর থেকে একটু নেমে এলেন।

' "শ্‌ শ্‌!" ব'লে উঠলেন আন্দ্রেওলি, "শুনতে পাচ্ছেন?"

' "কী?" জাম্বেকারি জিগেশ করলেন।

' "কি রকম অদ্ভুত একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে⋯"

' "তুমি ভুল করেছো আন্দ্রেওলি।"

' "না।"

'একবার ভেবে দেখুন তাঁদের অবস্থা: গভীর রাতে, মহাশূন্যে, অন্ধকারে কানে আসছে রহস্যময় কোনো অনির্ণেয় শব্দ। তবে কি কোনো স্তম্ভের গায়ে গিয়ে ধাক্কা লাগবে, না কি কোনো মিনারে বা বাড়ির গম্বুজে গিয়ে

চোট খাবে! কোনো ছাতে গিয়ে পড়বে কি তবে বলুন?

' "শুনছেন? আমার মনে হচ্ছে সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ!"

' "অসম্ভব!"

' "সত্যি তাই! ঢেউয়ের শব্দই!"

' "তা-ই তো! ঢেউয়ের কাৎরানি ব'লেই তো মনে হচ্ছে!"

' "আলো! আলো!"

'বার কয়েক প্রাণপণ চেষ্টায় পরও আন্দ্রেওলি আলো জালতে পারলেন না। রাত তখন তিনটে, নিচে তখন ভীষণ ঢেউগুলো গর্জাচ্ছে—রোষে ক্ষোভে অস্থির সমুদ্র—ঢেউগুলো যেন সবকিছু গিলে খাবে! স্তব্ধ রাতে সেই গর্জন শোনালো আরো ভয়ংকর। বলুন তখন নিচে নামছে, সমুদ্র প্রায় ছোঁয়-ছোঁয়।

' "আর আমাদের রক্ষে নেই!" মস্ত একটা বালির বস্তা দোলনা থেকে ফেলে দিলেন জাম্বেকারি।

' "বাঁচাও বাঁচাও!" অনর্থক সেই মহাশূন্যে চেঁচিয়ে উঠলেন আন্দ্রেওলি!

'দোলনাটা জল ছুঁলো। লাফিয়ে উঠলো ঢেউ, জলের ঝাপটা লাগলো বুকে পিঠে।'

' "কলকব্জা, পোশাক আশাক টাকাকড়ি—সব ফেলে দাও!"

'সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হ'য়ে গেলেন বৈমানিকেরা। আগের চেয়ে হালকা হ'য়ে বেলুন তক্ষুনি অতি ক্ষিপ্রবেগে ওপরে উঠে এলো। ঝাঁকুনি লেগে বমি পেলো জাম্বেকারির। গ্রোসেত্তির নাক-মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে। জোরে-জোরে নিশ্বেস দিচ্ছেন—খাবি খাওয়ার দশা, কথা বলারও ক্ষমতা নেই। ঠাণ্ডায় হাত-পা অসাড়হিম, যেন অল্পক্ষণের মধ্যেই তুষারে তাঁদের দেহ ঢেকে যাবে। রক্তের মতো রাঙা ভাঙা চাঁদ উঠলো আকাশে—কোন একচক্ষু দানবের রুষ্ট রক্তিম, ভয়ংকর চোখ যেন।

'উচ্চ মণ্ডলে আধঘণ্টা এলোমেলো ঝাঁকুনি খেয়ে বেলুন আবার নিচে নামতে শুরু ক'রে দিলো। নিচে তখনও রাগি, গর্জমান সমুদ্র। রাত বাজে চারটে—দোলনাটা সমুদ্রে আদ্ধেক ডুবে গেছে, শুধু বেলুনটা ধুঁকতে ধুঁকতে দোলনাটাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বেলুনের রেশমি কাপড় যেন পাল, দোলনাটা যেন কোনো অদ্ভুত ভেলা।

'সকালবেলায় আবিষ্কার করলেন পেসারোর উলটো দিকে আছেন তাঁরা, উপকূল থেকে চার মাইল দূরে। তীরের কাছাকাছি যখন এসেছেন, তখন

হঠাৎ এলো দমকার ঝোড়ো হাওয়া, আর আবার তাঁদের টেনে নিয়ে গেলো বারদরিয়ার। আর রেহাই নেই, তাঁরা ভাবলেন। দু-একটা জেলেডিঙি ছিলো তখন সমুদ্রে—কিন্তু তাঁদের অদ্ভুত ভেলা দেখে ভয় পেয়ে তারা দূর দিয়ে চ'লে গেলো। শেষটায় এক বুদ্ধিমান মাঝি তাঁদের নৌকায় তুলে নিলে—নামিয়ে দিলে ফেরাদায়।

'ভয়ংকর অভিজ্ঞতা—দুঃস্বপ্নের মতো! কিন্তু আম্বেকারির বুকে ভয়ডর নেই, উৎসাহে তিনি সর্বক্ষণ জ্বলছেন। সুস্থ হ'য়েই আবার তিনি আকাশে উঠতে লাগলেন। একবার একটা গাছের গায়ে ধাক্কা খেলো তাঁর বেলুন—স্পিরিটল্যাম্প ভেঙে জামা-কাপড়ে স্পিরিট ছড়িয়ে গেলো—নিচে যখন নেমে এলেন তখন আধপোড়া।

'তাতেও তিনি হাল ছাড়েননি। শেষবার আকাশে উঠলেন ১৮১২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর—আবার সেই বোলোন থেকে। আবার ধাক্কা লাগলো এক গাছে, আবার তাঁর স্পিরিটল্যাম্প থেকে বেলুনে আগুন ধ'রে গেলো, তালগোল পাকিয়ে নিচে পড়লেন আম্বেকারি, মারা গেলেন। কিন্তু আকাশ যাদের ডাক দিয়েছে, তারা কি এ-সব তথ্য থেকে ভয় পায়? বরং জেদ তাদের বেড়ে যায়। আরো উঁচুতে উঠতে চায় তারা। যত তারা উঁচুতে ওঠে, তাদের মৃত্যুও ততই মহিমা পায়!'

বেলুনে তখন একটাও বালির বস্তা নেই, কলকব্জা পর্যন্ত এক-এক ক'রে ফেলে দেয়া হয়েছে। এসে পৌঁছেছি এক বিপুল উচ্চতায়। কথা বললেই আকাশের গায়ে ধাক্কা লেগে বিপুল জোরে ফিরে আসছে যেন প্রতিধ্বনি। নিচে ধীরে-ধীরে মিলিয়ে এলো চেনা পৃথিবী, আর ওপরে পুরু অন্ধকারে হারিয়ে গেলো তারায় ভরা আকাশ।

হঠাৎ আমার উন্মাদ সহযাত্রীটি উঠে দাঁড়ালো। 'অবশেষে সময় হ'লো' সে বললে, 'এবার আমাদের মরতে হবে, ম র তে ই হবে। লোকে আমাদের ত্যাগ করেছে, আমাদের তারা ঘৃণা করে, ব্যঙ্গ করে। আসুন, তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি।'

চেঁচিয়ে উঠলুম, 'হা ঈশ্বর।'

'আসুন, এই দড়িগুলো কেটে দিই: দোলনাটা তাহ'লে হুহু ক'রে আকাশে ভেসে যাবে—নিরুদ্দেশে ভেসে যাবে। অভিকর্ষ ঠিক দিক বদলাবে, তখন দেখবেন সূর্যের টানে আমরা সেই বিপুল ও জ্যোতির্ময় অগ্নিকুণ্ডের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।'

হতাশাই বোধহয় আমার মধ্যে নতুন শক্তি এনে দিয়ে থাকবে, মরিয়া হ'য়ে আমি লাফিয়ে পড়লুম সেই উন্মাদের উপর। প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি ধাক্কাধাক্কি চললো দুজনে—আর যুযুধান আমাদের নিয়ে বেলুন কেবলই দুলে-দুলে উঠলো। কিন্তু কী জোর তার গায়ে! ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে সে আমাকে, তারপর হাঁটু দিয়ে আমাকে চেপে রেখে সে দোলনার দড়ি কাটতে শুরু করলে।

'এক!' সে চেঁচিয়ে উঠলো।

'হা ঈশ্বর!'

'দুই! তিন!'

অতিমানুষিক শেষ চেষ্টায় সেই উন্মাদকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে আমি উঠে দাঁড়ালুম।

'চার!'

একবার পাক খেয়েই নিচে নেমে গেলো দোলনা। বিদ্যুৎচালিতের মতো দড়ি ধ'রে ঝুলে পড়লুম আমি, তারপর কোনো রকমে গিয়ে উঠলুম বেলুনের জালের মধ্যে।

সেই উন্মাদ ততক্ষণে শূন্যে হারিয়ে গেছে।

দোলনাহীন বেলুন তখন আরো উঁচুতে গিয়ে পৌঁছেছে। কত উঁচুতে? জানি না! হঠাৎ প্রচণ্ড আওয়াজ হ'লো সেই অসীম নির্জন শূন্যে, কী যেন ফেটে গেলো। গ্যাস প্রসারিত হয়েছিলো অসহ্য রকম, তাই বেলুনের রেশমি আবরণ ফেটে গিয়েছে। আমি চোখ বুজে ফেললুম।

একটু পরে কবোষ্ণ কিসের স্পর্শ পেয়ে চেতনা ফিরে এলো। আগুনজলা মেঘের মাঝখানে বেলুন ঘুরপাক খাচ্ছে—যেন তার ঝুঁটি চেপে ধরলো হাওয়া, ঘণ্টায় একশো লিগ বেগে অনুভূমিক পথে টেনে নিয়ে এলো তাকে চারপাশে, ঝলশাতে লাগলো বিদ্যুৎ।

খুব জোরে পড়ছিলুম না বোধহয়। চোখ খুলে দেখলুম, নিচে ডাঙা দেখা যাচ্ছে। সমুদ্র থেকে মাইল দু-এক দূরে আছি এখনও, কিন্তু ঝোড়ো হাওয়ার গতি সমুদ্রের দিকেই। হঠাৎ কিসে যেন ধাক্কা লাগলো আচমকা, আমার মুঠো কেমন যেন আলগা হ'য়ে গেলো, হাত থেকে দড়িটা পিছলে গেলো, কঠিন মাটিতে এসে পড়লুম আমি!

ধাক্কা লেগেছিলো একটা নোঙরের গায়ে: ঝড় তাকে টেনে নিয়ে আসে, তারপর একটা ফাটলে প'ড়ে আটকে যায়; শেষভার প'ড়ে যেতেই আরেকটু

উঁচুতে উঠে সমুদ্রের দিকে চ'লে গেলো বেলুন, আস্তে-আস্তে ছোটো হ'য়ে এলো দিগন্তে।

+

জ্ঞান ফিরতে দেখি আমস্টারডাম থেকে পনেরো লিগ দূরে না স্থহয়লান্ড্-এর ৎস্থইভের সাগরের তীরে হার্ডেরহিকে এক চাষীর কুটিরে শুয়ে আছি।

বেঁচে গেছি শুধু ভগবানের করুণায়। আকাশে ও-রকম ভয়ংকর পাগলের পাল্লায় প'ড়ে বাঁচলুম কী ক'রে নেহাৎ যদি ভগবানের দয়া না-থাকতো!

কিন্তু সেই পাগল সত্যি কথাই বলেছিলো; আকাশ যাদের ডাক দিয়েছে, ডাঙার লোকেরা তাদের মোটেই বোঝে না; আকাশ যাদের ডাক দিয়েছে, তাদের অনেকেরই পরিণাম হয়েছে প্রচণ্ড ভীষণ। কিন্তু ডাক শুনে কে ব'সে থাকতে পারে তার নিরুৎসাহ বন্ধ ঘরের ভয়ভর পাওয়া অন্ধকারে?
